করোনা কালে হৃদরোগ

ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ

করোনা কালে হৃদরোগ	ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ
প্রকাশকাল	ফেব্রুয়ারি ২০২১
©	লেখক
প্রকাশক	জান্নাতুন নিসা
প্রকাশনায়	**য়ারোয়া বুক কর্ণার** ৮ম তলা (৮০৫), রোজভিউ প্লাজা লিমিটেড ১৮৫, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ **ফোন:** ০১৭২৬-৭৪০৮৬৮, ০১৭১১-৭০৪৪০২
প্রচ্ছদ	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
কম্পোজ	কে এল গাফিক্স রানীর দীঘির দক্ষিণ পূর্ব পাড় কুমিল্লা
প্রকাশনা সহযোগী	হার্ট কেয়ার ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা www.heartcarefoundationcb.org
মুদ্রণ	কে এল গ্রাফিক্স কুমিল্লা
মূল্য	৩০০.০০ টাকা Price: Only Taka 300.00. Taka

Corona Kaley Hridrog by DR. Triptish Chandra Ghose Published by Jannatun Nesa Arwa Book Corner (ABC) 7th Floor (805), Rose View Plaza Limited 185, Biruttam CR Dutta Road, Dhanmondi, Dhaka-1205. Phone: 01726-740868, 01711-704402, 02-9660674, 9660676e-mail: arwabcinfo@gmail.com

Distributor
India: Kushumer Fera Prokashon, Diamond Harbour Press Club. Rabinranath Tagore Road, Diamond Harbour, West Bengal. Charupatra Prokashoni, 71 Keshob Chandra sen Street, Kolkata-70009. **America:** Muktodhara, Jackson Heights, New York **United Kingdom:** Songita Limited, 22 Briklen, London. **Canada:** ATN Mega Store, 2970 Danfoth Ave. Anyamela(Level 2)suite-202, 300 Danfoth Ave.Toronto

ISBN-978-984-8068-03-8

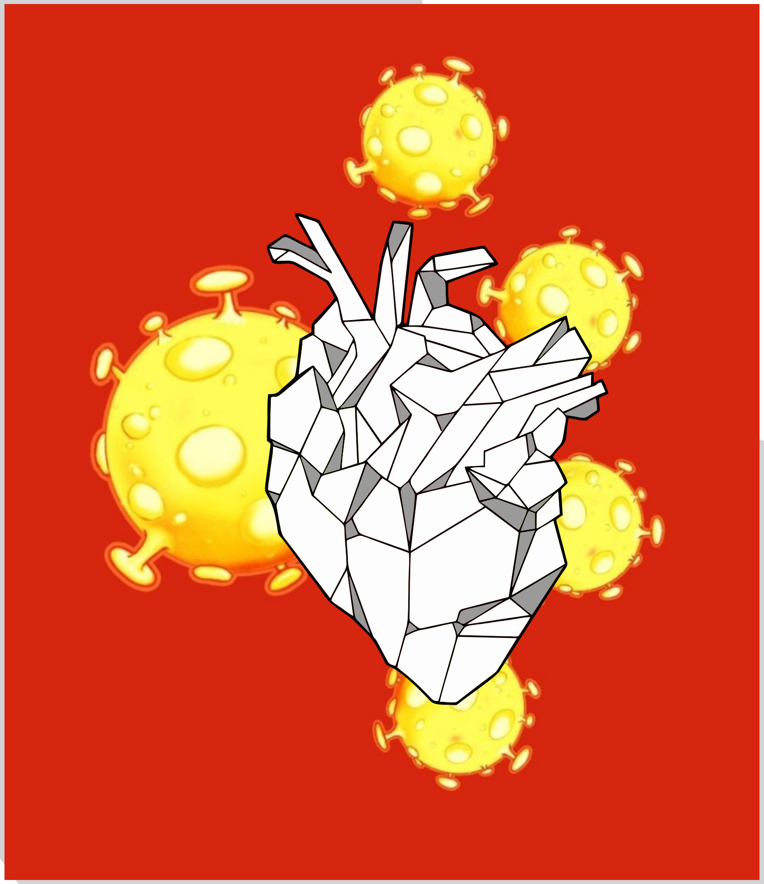

CARDIO VASCULAR DISEASE IN CORONA PANDEMIC

DR. Triptish Chandra Ghose

সূচীপত্র

১.ভুমিকা ~ ০৫
২.কোভিড-১৯ ~ ০৭
করোনা ভাইরাস কি? - সংঙ্গা ~ ১০
উপসর্গ ~ ১৩
প্রতিরোধ ~ ১৪
ক. স্বাস্থ্যবিধি ~ ২২
খ. টিকা ~ ২৯
চিকিৎসা ~ ৩১
৩.হৃদরোগ ও করোনা ~ ৩৩
৪.হৃদরোগের মতো অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য অবস্থার লোকেরা কোভিড ~ ৩৭
-১৯ এর ঝুঁকিতে বেশি ~ ৪১
৫.হৃদরোগীদের করোনা : ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা ~ ৪৩
৬.কোভিড -১৯ হার্টের কি ধরণের ক্ষতি করে? ~ ৪৯
৭.হৃদরোগের ওষুধও কি ক্ষতি করে? ~ ৫১
৮.হৃদরোগীদের বিশেষ সাবধানতা ~ ৫৪
৯.সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ বা হঠাৎ মৃত্যু ~ ৫৯
১০.ডায়াবেটিস থাকলে তা মাঝেমধ্যেই পরীক্ষা করান। ~ ৬৪
১১.কী কী সমস্যা থাকলে সাবধান হবেন ~ ৬৬
১২.কোভিড -১৯ ও মানসিক রোগ ~ ৬৮
১৩.করোনাকালে মানসিক দুশ্চিন্তায় হার্ট অ্যাটাক
১৪.ফুসফুস থেকে হার্ট...জটিল কোভিডে শরীরে দীর্ঘস্থায়ী কী
কী ক্ষতি হতে পারে ?
১৫.করোনা আক্রান্ত রোগীর হার্টে ছন্দ বৈকল্য

উৎসর্গ

বইটি প্রসঙ্গে

অধ্যাপক ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ একজন বিপুল জনপ্রিয় জনহিতৈষী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞই নন, তিনি একজন সুলেখক এবং কবিও বটে।
ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিষয়ক তাঁর লেখা ৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে।
"করোনা কালে হৃদরোগ"
বইটি বাংলা ভাষায় লেখা হৃদরোগ বিষয়ক প্রকাশনার জগতে একটি অনন্য সংযোজন।
করোনা মহামারী কালে করোনা ভাইরাস ও করোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত বিস্তর আলোচনা, গবেষণা ও লেখালেখি হয়েছে। করোনা সংক্রমণে মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ ও বিভিন্ন তন্ত্র আক্রান্ত হয় এর মধ্যে শ্বাসতন্ত্র ও হৃদসংবহনতন্ত্রের ক্ষতি হলেই মানুষ মৃত্যুবরণ করে।
"করোনা কালে হৃদরোগ" সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মাতৃভাষায় অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাবে লেখা জনসচেতনতা মূলক সুলিখিত একটি বই যা পড়ে যেকোন ব্যক্তি, হৃদরোগী, চিকিৎসক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র সকলেই উপকৃত হবেন।
মারণব্যাধী করোনা সংক্রমণ ও পরবর্তীতে হৃদরোগ সংক্রান্ত জটিলতা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে সকলের জন্য বইটি একই সাথে প্রয়োজনীয় ও সুখপাঠ্য হবে।

করোনা সংক্রমণ ও হৃদরোগ বহুলাংশে প্রতিরোধযোগ্য রোগ। লেখক তাঁর বইতে হৃদবান্ধব জীবনযাপন পদ্ধতি, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম ও আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন যা আদতে আমাদের মানব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। করোনায় আক্রান্ত রোগী যদি আগে থেকেই হৃদরোগী হন তবে তা আরো বিপদজনক। তাই হৃদরোগ প্রতিরোধ মূলতঃ করোনা প্রতিরোধ ও অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধেরই নামান্তর।
তথ্য সমৃদ্ধ এ বইটির প্রকাশ একটি জনকল্যাণমূলক সময়োপযোগী পদক্ষেপ।
আমি বইটির বহুল প্রচার ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডা. এ কে এম মহিবুল্লাহ
সভাপতি
বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি

ভূমিকা

দারুন বিধ্বংসী নোভেল করোনা ভাইরাস অথবা কোভিড-১৯ এর বিষাক্ত ছোবলে সারা পৃথিবী আজ প্রানঘাতি মহামারীতে আক্রান্ত। চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনা ভাইরাস আঘাত হেনেছিল ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর আর আমাদের দেশে প্রথম শনাক্ত হয়েছিল ৮ মার্চ ২০২০। ইতিমধ্যে আমরা একে নোভেল করোনা ভাইরাস অথবা কোভিড-১৯ নামে চিনেছি। চীন থেকে যাত্রা শুরু করে এটি একে একে পৃথিবীর ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে তার থাবা বিস্তার করেছে। ইতিমধ্যে ১০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্তের সংখ্যা আর মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২২ লাখ পেড়িয়ে গেছে। আমাদের দেশেও মৃত্যু সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।
মৃতদের বয়সের হিসাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৫০ বছরের বেশী বয়সী ব্যক্তিরাই সংখ্যায় বেশী মৃত্যুবরণ করছে। অর্থাৎ বয়স্করা বেশী মারা যায়। আর বয়স্কদের বেশী হারে মারা যাওয়ার প্রধান কারন হচ্ছে কো-মরবিডিটি অর্থাৎ যাদের শরীরে আগে থেকেই বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী ব্যাধি বাসা বেধে আছে তারাই মৃত্যুবরণ করছে বেশী। এই সকল কো-মরবিড বা সহযোগী অন্তর্নিহিত রোগের অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় হৃদরোগ শতকরা ১৩ ভাগের বেশী, শতকরা ৯ ভাগের বেশী ডায়াবেটিস ও দীর্ঘমেয়াদী ফুসফুসের রোগ, উচ্চরক্তচাপ এবং ক্যান্সার প্রতিটি শতকরা ৮ ভাগ করে। সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি যে, করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি যারা আগে থেকেই হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, দীর্ঘমেয়াদী ফুসফুসের রোগ এবং ক্যান্সারের মতো রোগে ভুগছেন তারাই বেশী হারে মৃত্যুবরণ করছে।
নিউইয়র্ক টাইমস -এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পৃথিবীতে ১৭০ কোটি মানুষেরই কমপক্ষে একটি এরকম অসুখ আছে যার কারনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের শারীরিক অবস্থা তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে মৃত্যুবরণ করে।

সম্প্রতি আমেরিকান এক গবেষণায় দেখা গেছে, একটি হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের মতো অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য অবস্থার লোকেরা কোভিড-১৯ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার এই সমস্ত অন্তর্নিহিত রোগবিহীন শুধুমাত্র কোভিড-১৯ আক্রান্তদের তুলনায় ৬ গুন বেশী এবং মৃত্যুহারও এদের তুলনায় ১২ গুন বেশী।

অনেক সময় দেখা গেছে করোনায় আক্রান্ত রোগীরা হার্ট অ্যাটাকের মতো উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। আবার অনেক সময় হার্ট ফেইলিউরের রোগীর মতো প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট নিয়েও হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে।

সুতরাং যাদের এই ধরনের সহযোগী অন্তর্নিহিত রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরী।

আমরা জানি, করোনার এখনও পর্যন্ত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কতৃক স্বীকৃত কোন চিকিৎসা নেই। ফলে আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপর। আমাদের নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে হবে,

বাইরে বের হলে অবশ্যই মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং একে অপরের মধ্যে ৬ ফুট নিরাপদ শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে সামাজিক দুরত্ব রক্ষা করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে হবে - তেল-চর্বি জাতীয় খাবার পরিহার করতে হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা বা সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট হালকা ব্যায়াম করতে হবে। দুশ্চিন্তা:মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। বাড়িতে বয়স্ক লোকজন থাকলে তাদের প্রতি বিশেষ সতর্ক নজর রাখতে হবে কারণ বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী সহযোগী অন্তর্নিহিত রোগ বয়স্কদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঘোষিত সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি আমাদের সকলেরই মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী। কারণ করোনা যুদ্ধে জয়ী হতে হলে করোনাকে প্রতিরোধই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। আর প্রতিরোধের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ভ্যাকসিন বা টিকা। আশার কথা হলো বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন এই ভ্যাকসিন দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তারপরও সারা পৃথিবী থেকে এই প্রানঘাতি ভাইরাসকে বিতারিত করতে আমাদের হয়তো আরও অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং এই ভাইরাস সৃষ্ট রোগ এবং তার সাথে বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি - হৃদরোগ এর যে সম্পর্ক সে বিষয়ে জানার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যাবে।

? করোনা ভাইরাস কি

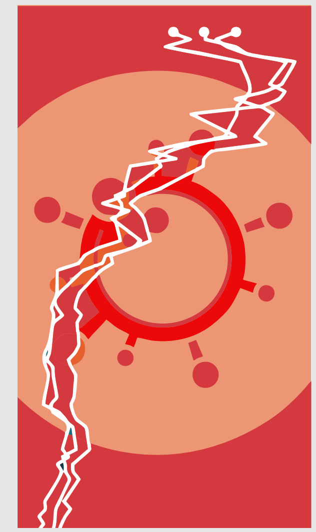

গঠনগতভাবে করোনা ভাইরাস একটা বিশাল আরএনএ (RNA) ভাইরাসের পরিবার। "করোনা" শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো মুকুট। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের তলায় এই পরিবারের ভাইরাসকে অনেকটা রাজার মাথার মুকুটের মতন দেখায়, সেই থেকে এই নামকরণ। অন্যসকল ভাইরাসের মতো এরাও জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য কোন না কোন একটা প্রাণী বা উদ্ভিদ কোষের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

এই ভাইরাসের সবচেয়ে বাইরের অংশে থাকে গ্লাইকোপ্রোটিনের স্পাইক বা কাঁটা যেগুলোর সাহায্যে ভাইরাসটি জীবন্ত কোষে আটকে গিয়ে সংক্রামিত হয়। দ্বিতীয় উপাদানটি হলো রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আরএনএ (RNA)। জীবন্ত কোষের ভিতরে প্রবেশ করে ভাইরাসটি আরএনএ-র প্রতিলিপি তৈরি করে বংশ বিস্তার করে। আর তৃতীয় উপাদানটা হ'ল একটা লিপিড স্তর, এটা ভাইরাসের অন্যান্য অংশকে ধরে রাখে। করোনাভাইরাস-এর মারাত্মক প্রকোপ এবং এবং তাকে কি করে ঠেকিয়ে রাখা যায়, সেটা বুঝতে হলে এই তিনটে অংশের কথাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

যদিও করোনাভাইরাসের অনেক প্রজাতি আছে, তার মধ্যে মাত্র সাতটা প্রজাতি মানুষের দেহে রোগ সংক্রমণ করতে পারে [১]। এদের মধ্যে চারটে সারা বছর ধরে অত্যন্ত সাধারণ হাঁচি-কাশি সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি করে। এরা হল, 229E (আলফা করোনাভাইরাস), NL63 (আলফা

করোনাভাইরাস), OC43 (বিটা করোনাভাইরাস), HKU1 (বিটা করোনাভাইরাস)।

এছাড়া, মার্স কভ (MERS-CoV) - এটা একটা বিটা করোনাভাইরাস যা থেকে ২০১২ সালে মিড্‌ল ইস্ট রেস্পিরেটোরি সিন্ড্রোম বা মার্স (Middle East Respiratory Syndrome, or MERS) ছড়িয়ে ছিল।

সার্স কভ (SARS-CoV) - এটাও একটা বিটা করোনাভাইরাস যা অতি তীব্র শ্বাস রোগ বা সার্স (severe acute respiratory syndrome, or SARS) ছড়িয়ে ছিল। প্রথম ২০০২ সালে চীন দেশে এই রোগ দেখা গিয়েছিল। মৃত্যুর হার প্রায় শতকরা ১০ জন, তবুও এই রোগকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছিলো কারণ মানুষ থেকে মানুষে তার সংক্রমণের হার ছিল কম। সব মিলিয়ে মোট ৮,০০০-এর কাছাকাছি রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয় ও প্রায় ৮০০ মানুষের মৃত্যু হয়। গবেষণায় প্রমাণ হয় যে একধরনের গন্ধগোকুল প্রজাতির প্রাণী থেকে এই ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল।

তৃতীয় আরেকটা টাইপ, সার্স কভ-২ (SARS-CoV-2) (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)-কেই নভেল করোনা ভাইরাস বলা হয়। এই সার্স কভ-২ মানুষের শরীরে কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস রোগ সংক্রামিত করে। এই ভাইরাসকে নভেল বা নতুন বলা হচ্ছে কারণ এই সংক্রামক ভাইরাসটা এর আগে কখনো মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি। ভাইরাসটার আরেক নাম ২০১৯-এনসিওভি (2019-NCOV)। মানুষ থেকে মানুষে এর সংক্রমণের হার প্রচুর বেশি।

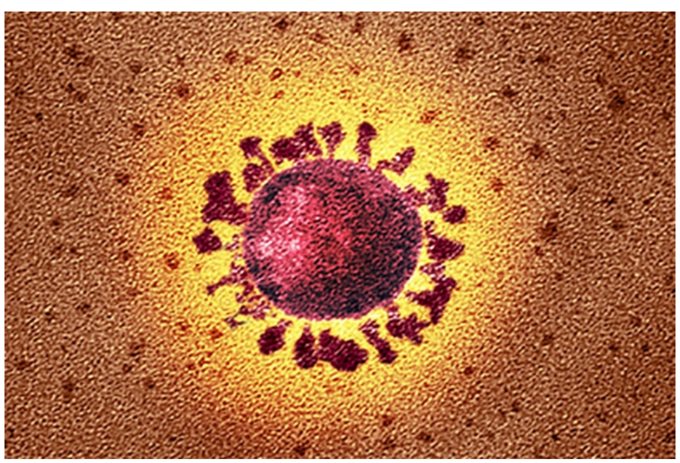

নতুন আবিষ্কৃত বা নভেল করোনা ভাইরাসের সংস্পর্শে মানুষের দেহে যে ছোঁয়াচে রোগ সৃষ্টি হয়, সেই রোগের নাম কোভিড-১৯ (COVID-19) বা নভেল করোনা ভাইরাস ডিজিজ (coronavirus disease)।

২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসে চীনদেশের উহান প্রদেশে সর্বপ্রথম এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ভাইরাস সংক্রমণ সব বয়সের মানুষের মধ্যে হলেও যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং যারা বয়স্ক, তাদের এই রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি [৪]।

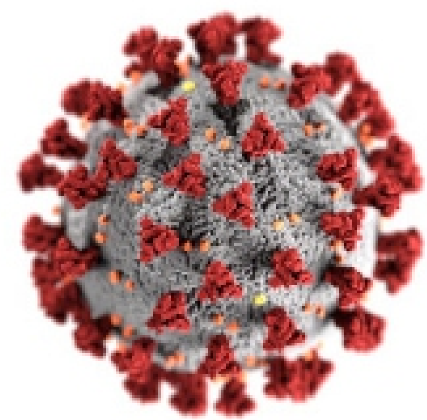

কোভিড-১৯ COVID 19 উপসর্গ?

রোগের উপসর্গ মূলতঃ **জ্বর, শুকনো কাশি, ক্লান্তি**।

এছাড়া **সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট, গলাব্যাথা, ডায়েরিয়াও** হতে পারে। সাধারণ ফ্লু বা সর্দিজ্বরের সঙ্গে এর অনেক মিল পাওয়া যায়। আক্রান্ত হবার পর প্রথম দিকে উপসর্গ খুবই কম থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কখনও কখনও এর পরিণামে নিউমোনিয়া ও শেষে মাল্টি অরগ্যান ফেইলিওর বা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে (১৪%)। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির কোন উপসর্গই থাকে না বা তারা অসুস্থ বোধ করেন না। প্রায় ৮০% আক্রান্ত মানুষই সেরকম কোন চিকিৎসা ছাড়াই সেরে ওঠেন।

জ্বর হলে, কাশি বা শ্বাসকষ্ট হলে দ্রুত নিকটস্থ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তিনি বিষয়টা খতিয়ে দেখে প্রয়োজন বুঝলে পরীক্ষা করাতে বলবেন। প্রতি ছ'জন আক্রান্তের মধ্যে, একজনের শ্বাসকষ্টজনিত গুরুতর অবস্থা হতে পারে। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, এবং যারা বয়স্ক (বিশেষত যাদের উচ্চ-রক্তচাপ, হার্টের সমস্যা বা ডায়াবেটিস রয়েছে) তাদের এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে [৬]।

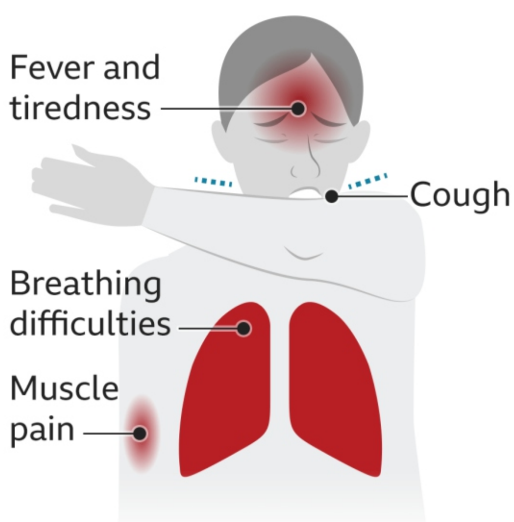

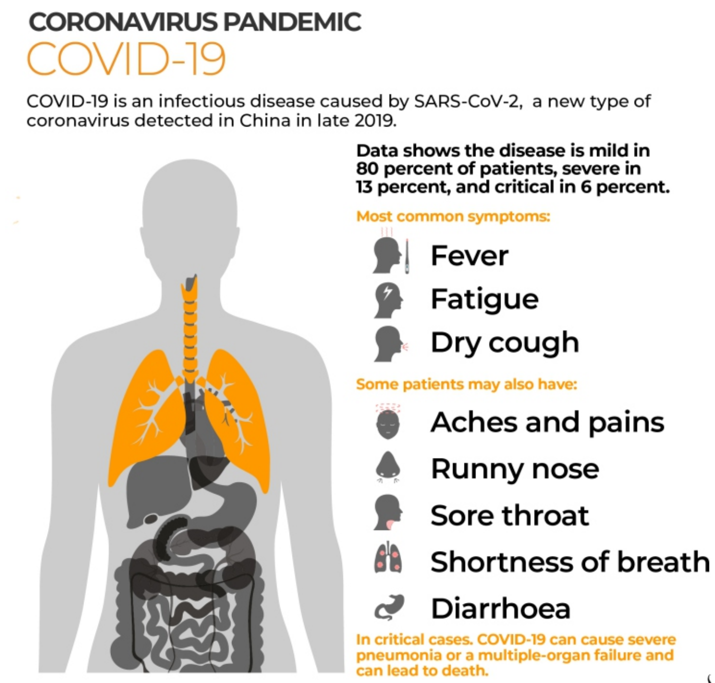

ডিলেরিয়াম বা বিভ্রান্তিসহ জ্বর হওয়া কোভিডের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে

জ্বর, শুকনো কাশি, অবসন্নতা, গন্ধ এবং স্বাদ অনুভূতি হ্রাস হ'ল সাধারণ প্রাথমিক লক্ষণ যা আপনার কাছে কোভিড-১৯ হিসাবে মনে হতে পারে। তবে, একটি নতুন গবেষণা অনুসারে আরও একটি লক্ষণ রয়েছে যা একটি সংক্রমণের প্রথম দিকে দেখা দেয় এবং যা ভাইরাসটি আপনাকে সংক্রমিত করেছে কিনা তা সনাক্ত করতে আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

প্রাথমিক চিহ্নটি কী?

ইউনিভার্সিটি ওবার্টা ডি ক্যাটালুনিয়া (ইউওসি) -এর গবেষকরা যে নতুন গবেষণা চালিয়েছেন এবং ক্লিনিকাল ইমিউনোলজি অ্যান্ড ইমিউনোথেরাপির ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে যে ডিলেরিয়াম বা বিভ্রান্তিসহ জ্বর হওয়া কোভিডের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। তারা উল্লেখ করেছেন যে এই মানসিক বিভ্রান্তি অন্যান্য লক্ষণগুলির প্রকাশও হতে পারে - স্বাদ এবং গন্ধ অনুভূতি হ্রাস, মাথা ব্যথা, কাশি এবং শ্বাসকষ্টের অসুবিধা।

"ডিলিরিয়াম হ'ল বিভ্রান্তির এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে ব্যক্তি বাস্তবের সংস্পর্শের বাইরে চলে আসে, যেন তারা স্বপ্ন দেখছে," ইউনিভার্সিটি অফ বোর্দো (ফ্রান্স) -এর এই গবেষণা চালিয়ে যাওয়া ইউওসি গবেষক জাভিয়ের কোরিয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে "বিশেষত এ জাতীয় মহামারী পরিস্থিতিতে আমাদের সজাগ থাকা দরকার, কারণ কোনও ব্যক্তি বিভ্রান্তির নির্দিষ্ট লক্ষণ উপস্থাপন করলে সংক্রমণের ইঙ্গিত হতে পারে।"

কোরিয়া এবং ইউওসি কগনিটিভ নিউরোল্যাব গবেষক ডিয়েগো রেডোলার রিপোল ভাইরাস কীভাবে মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে তার গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করে তারা দেখতে পায় যে, ফুসফুস বা শ্বাসতন্ত্র, কিডনি এবং হার্টে ভাইরাসের আক্রমনে ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকেও প্রভাবিত করে, মাথাব্যথা ও বিস্মৃত হওয়া ইত্যাদি সাইকোটিক এপিসোডসহ নিউরোকগনিটিভ পরিবর্তনগুলি তৈরি করে।

"মূল অনুমান যা ব্যাখ্যা করে যে করোনভাইরাস SARS-CoV-2 মস্তিস্ককে কীভাবে প্রভাবিত করে তার তিনটি সম্ভাব্য কারণ হলো: হাইপোক্সিয়া বা নিউরোনাল অক্সিজেনের ঘাটতি, সাইটোকাইন ঝড়ের কারণে মস্তিষ্কের টিস্যুর প্রদাহ এবং ভাইরাসটি ব্লাড-ব্রেইন বেরিয়ার বা রক্ত-মস্তিষ্কের বাঁধা অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে ফলে সে সরাসরি মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকে যায়। গবেষকগণ উল্লেখ করেন যে এই সমস্তগুলির ফলস্বরূপই Delirium বা বিভ্রান্তি হতে পারে এবং হাইপোক্সিয়া জনিত মস্তিষ্কের ক্ষয়ক্ষতি করোনভাইরাস আক্রান্তদের ময়নাতদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

অতএব, তারা বিশ্বাস করে যে অঙ্গগুলির সিস্টেমিক প্রদাহ এবং হাইপোক্সিয়া বা অক্সিজেন স্বল্পতাজনিত অবস্থাই হলো Delirium বা বিভ্রান্তির কারণ।

বিভ্রান্তির লক্ষণ

মেয়ো ক্লিনিক অনুসারে বিস্মৃত হওয়ার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা হ্রাস

এর ফলে হতে পারে:

কোনও বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে না পারা বা বিষয়গুলিতে স্যুইচ করতে না পারা

প্রশ্ন বা কথোপকথনের জবাব দেওয়ার চেয়ে কোনও ধারণায় আটকে থাকা

গুরুত্বহীন বিষয়গুলির দ্বারা সহজেই বিভ্রান্ত হওয়া

আশেপাশের পরিবেশ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করা, খুব কম সাড়া দেয়া বা কোনও কার্যকলাপ

দুর্বল চিন্তা দক্ষতা (জ্ঞানীয় দুর্বলতা)

এটি প্রদর্শিত হতে পারে:

বিশেষত সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির দুর্বল স্মৃতি

বিশৃখলা - উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোথায় আছেন বা আপনি কে তা জানেন না

কথা বলা বা স্মরণ করা অসুবিধা

বাজে বক্তব্য

বক্তব্য বোঝার সমস্যা

পড়া বা লেখার অসুবিধা

আচরণগত পরিবর্তন

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

অস্তিত্ব নেই এমন জিনিসগুলি দেখছেন (বিভ্রান্তি)

অস্থিরতা, আন্দোলন বা যুদ্ধমূলক আচরণ

কল করা, বিলাপ করা বা অন্য শব্দ করা

শান্ত থাকা এবং প্রত্যাহার করা - বিশেষত বয়স্কদের মধ্যে

ধীর গতিবেগ বা অলসতা

বিরক্তিকর ঘুমের অভ্যাস

রাত-দিনের ঘুম-জাগরণ চক্রের বিপরীত

মানসিক অশান্তি

এগুলির প্রকাশ হতে পারে:

উদ্বেগ, ভয় বা বিড়ম্বনা

বিষন্নতা

বিরক্তি বা ক্রোধ

অনুভূতি একটি পরিতৃপ্তি (আনন্দিত)

উদাসীনতা

দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত মেজাজ শিফট

ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন

আপনার মধ্যে করোনাভাইরসের উপসর্গ থাকলে কি করবেন?

যদি আপনার উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে (যতটাই হালকা হোক না কেন), আপনার উপসর্গগুলো শুরু হওয়ার দিন থেকে ১০ থেকে ১৪ দিনের জন্য বাসায় থাকুন এবং পরীক্ষা করানোর ব্যবস্'া করুন। পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া পর্যন্ত আপনার বাসায় থাকা উচিত এবং তারপর ফলাফরে ভিত্তিতে দেওয়া পরামর্শ আপনাকে মেনে চলতে হবে।

করোনাক্রান্ত লোক যাদের সাথে থাকে তাদেরকে কি কোনও পদক্ষেপ নিতে হবে?

যদি আপনি অন্য মানুষজনের সাথে থাকেন এবং আপনার উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে যখন থেকে আপনার উপসর্গ শুরু হয়েছে তখন থেকেই তাদের কোন উপসর্গ দেখা না দিলেও ১৪ দিন ধরে তাদেরকেও ঘরেই থাকতে হবে। যদি তাদেরও ১৪ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে তাদের যখন থেকে উপসর্গ শুরু হয়েছে তখন থেকে ১০ দিন ধরে ঘরে থাকতে হবে এবং পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি ১৪ দিনের আইসোলেশন পর্বের বেশি সময় লাগলেও তাদেরকে এটি করতে হবে।

কোভিড-১৯ রোগের ইনকিউবেশন পিরিয়ড (সুপ্ত কাল)

কোভিড-১৯ (COVID-19) একটা ছোঁয়াচে রোগ। নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু শরীরে ভাইরাস ঢোকা মানেই এমন নয় যে কোভিড-১৯ রোগের উপসর্গ সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে আরম্ভ করবে। কারোর ক্ষেত্রে দিন দুয়েকের মধ্যেই উপসর্গ দেখা দেয়, কারোর ক্ষেত্রে আবার সপ্তাহ দুয়েক! এই সময়কে বিজ্ঞানের ভাষায় ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation period) বলে। এখনো পর্যন্ত দেখা গেছে নভেল করোনাভাইরাসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড গড়ে পাঁচদিনের মত। অর্থাৎ, এই ইনকিউবেশান পিরয়ডের মধ্যে সংক্রমিত কেউ না জেনেই আরও অনেককে সংক্রামিত করতে পারে।

কোভিড-১৯ সংক্রমনের হার

ধরা যাক, একজন ব্যক্তি মাসের এক তারিখে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হল। এর পরের পাঁচদিন পর্যন্ত তার শরীরে কোভিড-১৯ এর কোন লক্ষণ ধরা পড়ে নি, কিন্তু সে অনেকের সাথে একসাথে আড্ডা দিয়েছে, একসাথে রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছে। আর এই মেলামেশার ফলে তার অজান্তেই দু-তিনজন সুস্থ মানুষের মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। মাসের ছ'তারিখ নাগাদ যখন তার কোভিড-১৯ এর লক্ষণ ধরা পড়ল তখন থেকে সে অন্যদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে কয়েকজনের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে ভাইরাস।

ওই ব্যক্তি যে দু-তিনজনের মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়েছে তারাও অন্যদের সাথে মেলামেশা করেছে! ধরা যাক তাদেরও কোভিড-১৯ এর উপসর্গ ধরা পড়তে দিন পাঁচেক সময় লেগেছে। তাহলে এই দুই-তিনজনের প্রত্যেকে আরও দু-তিনজন করে মানুষের মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়েছে! এবার যারা আক্রান্ত হল তাদের প্রত্যেকে আরো কিছু সুস্থ মানুষের মধ্যে ভাইরাস ছড়াবে। এমন করে মোট আক্রান্তের সংখ্যাটা খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকবে। একজন আক্রান্ত ব্যক্তি ভাইরাসের ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে ধরা যাক গড়ে R0 ('আর-নট' বা 'আর-জিরো' - Reproduction number of the virus বোঝাতে) সংখ্যক লোককে সংক্রমিত করে। নভেল করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা হল প্রায় আড়াই জন (মানে গড়ে আড়াই জন)। ইনকিউবেশন পিরিয়ড পাঁচদিন ধরে নিলে প্রথম পাঁচদিনের শেষে, মানে মাসের ছ'তারিখ নাগাদ গড়ে R0 জন সংক্রমিত হল। এর পরের পাঁচ দিনে এই R0-এর প্রত্যেকে আরও R0 জনকে সংক্রমিত করল। অর্থাৎ, মাসের এগারো তারিখ নাগাদ ভাইরাস আক্রান্ত লোকের সংখ্যা হল R0২। নভেল করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা হল গড়ে ২.৫২= ২.৫x২.৫ = ৬.২৫ অর্থাৎ গড়ে প্রায় ছ'জন। মাসের ষোল তারিখ নাগাদ ২.৫৩ = ২.৫x২.৫x২.৫ = ১৫.৬২৫ অর্থাৎ, আরো প্রায় ষোল জন সংক্রমিত হল। এইভাবে মাসের শেষের পাঁচদিনে নতুন সংক্রমিত লোকের সংখ্যা হবে

২.৫৬ = ২.৫x২.৫x২.৫x২.৫x২.৫x২.৫ = ২৪৪

অর্থাৎ প্রায় আড়াইশোর কাছাকাছি। তাহলে এক মাসের মধ্যে মোট সংক্রমণের সংখ্যা হল প্রায় চারশো জনের মত!

১+২.৫+৬.২৫+১৫.৬২৫+৩৯.০৬+৯৭.৬৫+২৪৪ = ৪০৬ ।

পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশের করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা সময়ের সাথে এইভাবে হু হু করে বাড়ছে। এই ধরণের বৃদ্ধিকে এক্সপোনেন্সিয়াল বৃদ্ধি (exponential growth) বলে।

এই অঙ্কটা বুঝলে এটাও বোঝা যাবে কেন কোভিড-১৯ সাধারণ ফ্লু থেকে অনেক বিপজ্জনক। সাধারণ ফ্লু -এর ক্ষেত্রে R0 হল ১ এর কাছাকছি, অর্থাৎ একজন

সংক্রমিত ব্যক্তি গড়ে একজনকে সংক্রমিত করে। কোভিড-১৯ ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ২.৫ , তাই অনেক তাড়াতাড়ি সংক্রমণ বাড়ছে।

এই সংক্রমণ বৃদ্ধির হারটা কমিয়ে দেওয়ার জন্য স্যোশাল আইসোলেশান, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বাড়িয়ে দেওয়ার অপরিসীম গুরুত্ব।

একজন ভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তির থেকে কতজন সংক্রমিত হবে তা নির্ভর করবে সেই ব্যক্তি ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে কতজনের সাথে মেলামেশা করেছে। সেই ব্যক্তি ও তার থেকে ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তিরা যদি যতটা সম্ভব নিজেদের অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো, তাহলে ভাইরাসের সংক্রমণের হার কম হতো অর্থাৎ R0 সংখ্যাটা কমে যেত।

আর সরকারের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির ফলে বেশিরভাগ রেস্টুরেন্ট, অফিস-আদালত- কারখানা বন্ধ থাকার কারণে এখন আগের চেয়ে অর্ধেক লোক অর্থাৎ গড়ে ১.২৫ জন একজনের থেকে সংক্রমিত হচ্ছে। অর্থাৎ, মাসের শেষ পাঁচদিনে মোট সংক্রমণের সংখ্যা হবে

১.২৫৬ = ১.২৫x১.২৫x১.২৫x১.২৫x১.২৫x১.২৫ = ৩.৮১৫ জনের মত। তাহলে সারা মাসে মোট সংক্রমণের সংখ্যা ১ + ১.২৫ + ১.২৫২ + ১.২৫৩ + ১.২৫৪ + ১.২৫৫ + ১.২৫৬ = ১৫ জনের মত। আগে যে সংখ্যাটা ছিল প্রায় চারশো, সেখান থেকে নেমে মাত্র পনেরো জনে এসে ঠেকেছে।

এ কারণেই এই ধরণের ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে আমাদের নিজেদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। যতদিন পর্যন্ত না টিকা বা চিকিৎসার সাহায্যে অথবা কোন প্রাকৃতিক কারণে ভাইরাসের কার্যক্ষমতা কমে পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে, ততদিন আমাদের এই একে অপরের মধ্যে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে হবে।

করোনা ভাইরাস যেভাবে ছড়ায়

করোনা ভাইরাস মানুষের ফুসফুসে সংক্রমন ঘটায়;

শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে (হাঁচি/কাশি/কফ/সর্দি/থুতু) এবং

আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায়

মূলত ভাইরাসটি ছড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির ফুসফুস থেকে উৎপন্ন প্রদাহ কণা (রেসপিরেটরি ড্রপলেট) এর মাধ্যমে যা হাঁচি বা কাশির সাথে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে ১ মিটার (৩ ফুট) দুরত্বে যেয়ে পড়ে। এই রেসপিরেটরি ড্রপলেট এর সংস্পর্শে আসলে যেমন আক্রান্ত ব্যক্তির ১ মিটার দুরত্বের কমে অবস্থান করলে বা ড্রপলেট ছড়িয়ে পড়া কোন তল (সারফেস) বা ব্যবহার্য্য সামগ্রী (যেমন টেবিল, চেয়ার, দরজার হাতল ইত্যাদি) হাত দিয়ে ধরলে এবং খালি হাতে নাকে মূখে বা চোখে হাত দিলে ভাইরাসটি সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

প্রধানত চারটে পর্যায়ে ভাইরাসটা ছড়ায়।

পর্যায় ১. বিদেশ থেকে আগত রোগীর মাধ্যমে (Imported Cases) - যে সমস্ত দেশে আগেই সংক্রমণ ঘটেছে সেই অঞ্চল থেকে কেউ সংক্রমণের শিকার হয়ে নিজের দেশে ফিরলে, তাকে প্রথম পর্যায়ের সংক্রমণ বলা হয়।

পর্যায় ২. আঞ্চলিক সংক্রমণ (Local Transmission) - বিদেশ থেকে আগত রোগীর সান্নিধ্যে এসে কেউ নিজে সংক্রামিত হলে তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ বলা হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, একজন আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে অন্য সুস্থ মানুষের সংক্রমণের সম্ভাবনা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা, যাতে সংক্রমণের শৃখলটাকে (transmission chain) কেটে দেওয়া যায়। সকলে সামাজিক দূরত্ব (social distance) বজায় রাখলে তবেই সংক্রমণ এই পর্যায়ে রোখা যাবে।

পর্যায় ৩ - পারস্পরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রমণ (Community Transmission) - বিদেশ থেকে আগত রোগীর বা যেকোন করোনা আক্রান্ত রোগীর সান্নিধ্যে না এসেও কেউ যখন সংক্রামিত হয় তখন তাকে তৃতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ বলা হয়। এই পর্যায়ের সংক্রমণ অনেক দ্রুত, অনেক বড় এলাকা জুড়ে হয়।

পর্যায় ৪ - মহামারী (Epidemic) - এটা শেষ এবং সবথেকে খারাপ পর্যায় যখন সংক্রমণ অত্যন্ত দ্রুত মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই পর্যায়ের সংক্রমণ একবার হয়ে গেলে কবে, কিভাবে আটকানো যাবে, তা বলা অসম্ভব।

করোনা ভাইরাস বাতাসে ছড়ায়

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিশ্চিত করেছে যে, এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য-প্রমান এখন পাওয়া যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাস বাতাসে ছড়ায়। অতি সম্প্রতি ২৩৯ জন বিজ্ঞানী এক যৌথ বিবৃতিতে দাবী করেন যে করোনা ভাইরাসের জীবানু ড্রপলেটের মাধ্যমে বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে এবং মানুষ তার মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে। এর পরপরই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে যে, করোনা ভাইরাস মহামারী সংক্রমনের মাধ্যম এবং এর প্রেক্ষিতে কী কী সতর্কতা গ্রহন জরুরী সবকিছু বিষয়ে যে সকল তথ্য ইতিমধ্যে প্রমানিত হয়েছে তা খোলামেলাভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা দরকার।
বলা হচ্ছে সাধারণত জনসমাগম যেখানে হয় বিশেষ করে সভা-সমাবেশ, মিছিল, হাট-বাজার এই সকল স্থান ছাড়াও বদ্ধ ঘর - যেখানে দরজা-জানালা নেই অর্থাৎ বাতাস ঠিকমতো চলাচল করতে পারেনা এই সকল স্থানে বায়ুবাহিত সংক্রমনের সম্ভাবনা থাকে বিধায় এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।
বায়ু বাহিত ড্রপলেট নিউক্লিয়াসগুলোর আকার খুবই ছোট। এগুলো ৫ মাইক্রনের চেয়েও ছোট যা বাতাসে অনেক্ষন ভেসে থাকতে পারে এবং এভাবেই শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে মানুষের ভিতর প্রবেশ করে মানুষকে সংক্রমিত করে।
সুতরাং আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানতে হবে এবং মেনে চলতে হবে-

১. বায়ুবাহিত সংক্রমন প্রতিরোধ করতে হবে।
২. যক্ষা, হাম, জলবসন্ত ইত্যাদিও বায়ু বাহিত রোগ হওয়ায় সংক্রমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহনে এই সকল রোগ প্রতিরোধও সহজ হবে।
৩. সভা-সমাবেশ, মিছিল, হাট-বাজার এবং ধর্মীয় উপাসনালয় - এই সকল স্থান এড়িয়ে চলতে হবে।
৪. দরজা-জানালাহীন বদ্ধ ঘর যেখানে ঠিকমতো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই সেই সকল স্থান এড়িয়ে চলতে হবে।
৫. ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
৬. সরকারকেও এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।

করোনাক্রান্ত মৃতদেহ কি কোভিড-১৯ ছড়াতে পারে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে মৃতদেহ থেকে কোভিড-১৯ ছড়ানোর কোন ভয় নেই।
এই সার্স-কোভ-টু ভাইরাস প্রধানতঃ ছড়ায় মানুষের নাকমুখ থেকে বের হওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরল কনার মাধ্যমে যাকে বলে ড্রপলেটস। মানুষ যখন কথা বলে এবং হাঁচি-কাশি দেয়া তখনই এই ড্রপলেট ছিটকে বের হয়। তবে এই ভাইরাস কিছু কিছু জায়গায় বা সারফেসের উপর কয়েক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন মৃতদেহ থেকে জীবিত মানুষের দেহে এই সংক্রমণ ছড়ানোর কোন প্রমান পাওয়া যায়নি।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশে বলা হয়, ইবোলা বা মারবুর্গের মতো অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় এমন জ্বর বা কলেরা ছাড়া অন্য মৃতদেহ সাধারনতঃ সংক্রামক নয়। এতে বলা হয়, "শুধুমাত্র ময়না তদন্তের সময় যদি মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত ব্যক্তির ফুসফুস অসতর্কভাবে স্পর্শ করা হয় - তাহলে তা সংক্রামক হতে পারে। তা ছাড়া সাধারণতঃ মৃতদেহ রোগ ছড়াতে পারে না।
কিন্তু শ্বাসতন্ত্রের রোগে মারা যাওয়া মানুষের ফুসফুস বা অন্যান্য প্রত্যঙ্গে জীবন্ত ভাইরাস থাকতে পারে। এ ভাইরাস অটোপ্সি বা ব্যবচ্ছেদের সময় চিকিৎসা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে, বা মৃতদেহের অন্ত্রভোগ পরিষ্কার করার সময় বেড়িয়ে আসতে পারে।
কোভিড-১৯ এ মারা যাওয়া ব্যক্তির আত্মীয় বা নিকটজনদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রশিক্ষিত এবং সুরক্ষা পোশাক পরা পেশাদার কর্মীরা মৃতদেহটিকে শেষকৃত্যের জন্য তৈরী করে দেন।

কোভিড-১৯ আক্রান্তের মৃতদেহ সৎকারের উপায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে মৃতদেহ কবর দেয়া বা দাহ করা - দুটোই গ্রহনযোগ্য। মৃত ব্যক্তির মর্যাদা, তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সব সময় রক্ষা করতে হবে, এবং তাদের পরিবারের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

করোনাভাইরাস সারফেসে বা কোন জিনিসের উপর বেঁচে থাকার সময়

কোভিড-১৯ (COVID-19) একটা সংক্রামক রোগ। এটি মানুষ থেকে মানুষে ড্রপলেট ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে ছড়ায়। অর্থাৎ, কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির সময় যে অতি সূক্ষ্ম জলের ফোঁটা বা এরোসল তৈরী হয় তার মাধ্যমে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে। সেইজন্য এই নভেল করোনা ভাইরাস কোনো জিনিসের পৃষ্ঠতলে ঠিক কতক্ষণ বাঁচতে পারে সেইটা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্থ-এর একদল বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, এই ভাইরাসটা এরোসলে অর্থাৎ বাতাসে সূক্ষ্ম ড্রপলেট অবস্থায় প্রায় ৩ ঘন্টা পর্যন্ত বাঁচতে পারে। কার্ডবোর্ড-এর উপর ভাইরাসটা প্রায় ২৪ ঘন্টা এবং প্লাষ্টিক বা স্টেইনলেস স্টিল এর উপর প্রায় তিন দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে সক্ষম [৯]।

করোনায় মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার উচ্চ ঝুঁকিসমূহ

কিছু মানুষের করোনাভাইরাসের কারনে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। তাদেরকে কঠোরভাবে শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখার এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত পদক্ষেপগুলো মেনে চলতে হবে। তাদের পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য পরিচিতরাও যেন কঠোরভাবে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত পদক্ষেপগুলো মেনে চলেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উচ্চ ঝুঁকিগ্রুপ

এই গ্রুপে সেই সকল লোকজন অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন যারা

- ৭০ বা তার চেয়ে বেশি বয়সী (তাদের চিকিৎসাগত সমস্যা যাই হোক না কেন)
- ৭০ এর চেয়ে কম বয়সী এবং চিকিৎসাগত ভিত্তিতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে প্রত্যেক বছরে ফ্লু -এর টিকা গ্রহন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- গর্ভবতী

এবং যাদের নিম্নবর্ণিত সমস্যা আছে:

- দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসের রোগ: যেমন হাঁপানি, ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি), এমফাইসিমা বা ব্রঙ্কাইটিস রয়েছে
- দীর্ঘস্থায়ী হৃদরোগ, যেমন হার্ট ফেইলিউর
- দীর্ঘস্থায়ী কিডনির রোগ
- দীর্ঘস্থায়ী লিভারের রোগ
- দীর্ঘস্থায়ী স্নায়বিক সমস্যা, যেমন পারকিনসন্স রোগ, মোটর নিউরন রোগ, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস), শিক্ষাগত অক্ষমতা বা সেরিব্রাল পালসি
- ডায়াবেটিস
- যাদের প্লীহাতে সমস্যা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ সিকল সেল ডিজিজ

- এইচআইভি এবং এইডস এর মতন সমস্যা বা স্টেরয়েড ট্যাবলেট বা কেমোথেরাপির ফলস্বরূপ যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে থাকে
- এমন সকল লোক যাদের ওজন মাত্রাতিরিক্তভাবে বেশি এবং যাদের বিএমআই ৪০ বা তার চেয়ে বেশি।

অত্যন্ত মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার উচ্চ ঝুঁকি

করোনাভাইরাস সংক্রামিত হলে কিছু মানুষের মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রচন্ড ঝুঁকি আছে। এই লোকদের শারীরিক দুরত্ব এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। তাদের পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য পরিচিতরাও যেন কঠোরভাবে শারীরিক দুরত্ব এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা বজায় রাখার পদক্ষেপগুলি মেনে চলেন।

অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিরগ্রুপ

এই গ্রুপে সেই সকল লোকজন রয়েছেন যারা:

- ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং সক্রিয়ভাবে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন
- ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রয়েছেন এবং তারা হয় সম্প্রতি বা আগে রেডিকেল কেমোথেরাপি নিচ্ছেন
- লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা বা মায়োলোমার মতন রক্ত বা অস্থিমজ্জার ক্যান্সারে আক্রান্ত লোকেরা যারা চিকিৎসার যেকোন পর্যায়ে রয়েছেন
- তীব্র বুকের সমস্যা যেমন সিস্টিক ফাইব্রোসিস, তীব্র হাঁপানি, তীব্র সিওপিডি, তীব্র ব্রংকাইটিস এবং পালমোনারি হাইপারটেনশন
- ডবরল রোগে আক্রান্ত যার মধ্যে সকল ধরনের ইন্টাস্টিসিয়াল লাং ডিজিজ / সারকোয়ডোসিস এবং জন্মগত বিপাক ক্রিয়ার ক্রটি যে কারণে তাদের ক্ষেত্রে সংক্রমনের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় যেমন এসসিআইডি এবং হোমোজাইগাস সিকল সেল)
- প্লীহা নেই বা তাদের প্লীহা অপসারণ করা হয়েছে
- গর্ভবতি মহিলারা যারা জন্মগতভাবে বা পরবর্তিতে হৃদরোগে আক্রান্ত।

এবং যাদের নিম্নবর্ণিত কোনটি হয়েছে:

- পূর্ণ (সলিড) অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে
- গত ৬ মাসে অস্থি মজ্জা বা স্টেম সেল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে বা যারা এখনও ইমিউনোসাপ্রেশন ওষুধ গ্রহন করছেন

অথবা নিম্নবর্ণিত গ্রহন করছেন:

- ইমিউনোথেরাপি বা ক্যান্সারের জন্য অন্যান্য চলমান অ্যান্টিবডি চিকিৎসা নিচ্ছেন
- অন্যান্য লক্ষ্যযুক্ত ক্যান্সারের চিকিৎসা যা রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন প্রোটিন কাইনেজ ইনহিবিটর বা পিএআরপি

ইনহিবিটর

- ইমিউনোসাপ্রেশন থেরাপি যার কারণে সংক্রমনের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়
- রেনাল ডায়ালাইসিস চিকিৎসা

শিশুদেরও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে

শিশু-কিশোরদের কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। CDC (Center for Disease Control and Prevention), China থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে ০-৯ বছরের শিশু এবং ১০-১৯ বছর বয়সীদের আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ০.৯% এবং ১.২% মাত্র [১০]। আরেকটা সমীক্ষা অনুসারে, কোভিড-১৯ আক্রান্তদের মধ্যে ০-১৪ বছরের বাচ্চাদের সংখ্যা ০.৯% যেখানে বড়দের (১৫-৪৯বছর) সংখ্যা ৫৭.৮% [১১]। কিন্তু কেবলমাত্র কোভিড-১৯ আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে প্রকাশিত আরেকটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রের ফলাফল অনুসারে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ছোট (<৫ বছর), বিশেষত নবজাতকদের মধ্যে শারীরিক অবস্থার সংকটজনক অবনতি হবার প্রবণতা কিছুটা বেশী [১২]। আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলোজির গবেষনায় দেখা গেছে কোভিড-১৯ শিশুদের হার্টেরও ক্ষতি করে। তাই শিশুদের ক্ষেত্রেও সমস্তরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত জরুরি।

কোভিড-১৯ এর সাথে সম্পর্কিত ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম

১. মৃদু রোগ (ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ)
২. নিউমোনিয়া
৩. মারাত্মক নিউমোনিয়া
৪. অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম (এআরডিএস)
৫. সেপসিস
৬. সেপটিক শক

কোভিড-১৯ রোগ নির্ণয়

১. ভাইরাস সনাক্তকরণ ঃ ক. নমুনা নাক-মুখ-গলা থেকে লালা বা সোয়াব সংগ্রহ
খ. ভাইরাল নিউক্লিক এসিড এটিই সর্বাধিক প্রচলিত কোভিড-১৯ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি
- আরটি-পিসিআর (RT-PCR – Real Time Polymerase Chain Reaction)
গ. র‌্যাপিড টেষ্ট অ্যান্টিজেন টেষ্ট (NAAT

২. রেডিওলজি ও ইমেজিং ক. চেষ্ট বা বুকের সিটি স্ক্যান (HRCT of Chest)
খ. চেষ্ট বা বুকের এক্সরে (Chest X-ray)
গ. চেষ্ট বা বুকের আল্ট্রাসনোগ্রাফি (USG of Chest)

৩. সহায়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক. রক্ত পরীক্ষা - পূর্ণ চিত্র

সিআরপি (C-Reactive Protein)

প্রোক্যালসিটনিন (Procalcitonin)

সিরাম ফেরিটিন (Serum Ferritin)

ডি-ডাইমার (D-dimer)

সিরাম এলডিএইচ (Serum LDH)

করোনা ভাইরাস সনাক্তকরন পরীক্ষা

বস্তুত যেকোনো জায়গাতেই এই পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব। সাধারণতঃ রোগীর গলার ভিতরে একটি তুলোর ডেলা (cotton swab) প্রবেশ করিয়ে, সেটার সাহায্যে লালা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। এছাড়া র‍্যাপিড টেস্টে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি লক্ষ্য করার জন্য রক্ত পরীক্ষাও করা যেতে পারে। তবে সম্ভবতঃ শুধুমাত্র চীনেই সেই পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়াটা সহজ হলেও ল্যাবরেটারীতে তা পরীক্ষা করার পদ্ধতিটা বেশ জটিল। নমুনাটা দিয়ে রিয়াল টাইম পলিমারেজ চেন রিয়েকশান (Real Time Polymerase Chain Reaction) করা হয়। যেকোনো পলিমারেজ চেন রিয়েকশান (PCR) কোষের ডিএনএ-তে (DNA) ঘটে। কিন্তু, যেহেতু করোনা ভাইরাস একটা আরএনএ (RNA) ভাইরাস, তাই পরীক্ষাটার প্রথম ধাপে রোগীর দেহ থেকে প্রাপ্ত নমুনায় ভাইরাস থাকলে তার আরএনএ প্রথমে DNA-তে রূপান্তরিত হয়। তারপর PCR পদ্ধতিতে DNA-র অগুন্তিবার রেপ্লিকেশান ঘটে যে প্রতিলিপি তৈরি হয়, তা থেকে নমুনাতে ভাইরাসের উপস্থিতি সহজেই বোঝা যায়। সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে করোনা পজিটিভ বলা হয়। আর ভাইরাস না থাকলে কোন প্রতিলিপিই তৈরি হয় না। সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে করোনা নেগেটিভ বলা হয়। ২৪ ঘন্টা লাগে টেস্টের রেজাল্ট আসতে। তবে প্রচুর নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে, সব ধাপগুলো একবারে করার সুযোগ না থাকায় অনেকসময় ৪৮-৭২ ঘন্টাও লাগতে পারে[৮]।

চিকিৎসার ব্যবহারিক সুবিধার্থে কোভিড-১৯ এর ৬টি সিনড্রোমকে ৪ টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

১. মৃদু - মৃদু রোগ (ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ)

২. মাঝারি - নিউমোনিয়া

৩. মারাত্মক - মারাত্মক নিউমোনিয়া, সেপসিস

৪. সংকটাপন্ন - অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম (এআরডিএস), সেপটিক শক

মৃদু উপসর্গসহ কোভিড-১৯ রোগী অর্থাৎ যারা সাধারণ জ্বর, সর্দিকাশি, গলাব্যাথায় ভুগছেন তাদেরকে রোগ সংক্রমণ ও হাসপাতালে ভিড় কমানোর স্বার্থে বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা নিতে বলা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আইইডিসিআর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হট লাইনে ফোন করে অথবা টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারবেন।

মাঝারি গ্রুপের রোগী যাদের মধ্যে মারাত্মক নিউমোনিয়ার লক্ষন নেই বা যাদের অক্সিজেন নেয়ার প্রয়োজন নেই তাদেরও বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা নিতে বলা হচ্ছে।

বাকি যারা মারাত্মক ও সংকটাপন্ন গ্রুপে আছেন এবং যাদের অন্তর্নিহিত সহযোগী

রোগ রয়েছে তাদের হাসপাতালে ভর্তি লাগবে প্রয়োজনে হাই-ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা দিয়ে অক্সিজেন এবং ভেন্টিলেটর সাপোর্টসহ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে থাকতে হতে পারে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধের সাধারণ উপায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation) নভেল করোনা ভাইরাসের প্রকোপে উদ্ভব হওয়া পরিস্থিতিকে প্যান্ডেমিক বা মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কিন্তু শুধুমাত্র প্রশাসন নয়, প্রত্যেক মানুষকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবেই এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার গতি রোধ করা সম্ভব।

হাত সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরপর সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুতে হবে। হাতের তালু, আঙুল ও কব্জি পর্যন্ত ভাল করে সাবান দিয়ে ঘষে ধুতে হবে (অন্তত কুড়ি সেকেন্ড ধরে)। হাতে ময়লা দেখা না গেলেও বারবার হাত ধুতে হবে। বিশেষ করে হাত ধুতে হবে অসুস্থ ব্যক্তির পরিচর্যার পর, হাঁচি বা কাশির পর, খাবার রান্না করার আগে, খাবার পরিবেশন করার আগে, বাথরুম ব্যবহারের পর এবং পশুপাখির পরিচর্যার পর।

হাত পরিষ্কার করার জন্য যে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে, তাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ ৭০% থেকে ৯৫% হওয়া প্রয়োজন।

হাঁচি-কাশি হলে, নাক দিয়ে সর্দি জল পড়লে মুখে মাস্ক পরতে হবে।

সারাদিন যথাসম্ভব নাকে মুখে হাত দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। হাত দিয়েই আমরা প্রধানত সব কাজ করি বলে সারাদিন অনেক কিছু স্পর্শ করি যার থেকে ভাইরাস হাতে লেগে যেতে পারে। তাই অপরিষ্কার হাত দিয়ে কখনো নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করা উচিৎ নয়।

সর্দি-কাশি বা জ্বর হয়েছে এমন লোকজনের থেকে অন্তত এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কারণ আর সব ফ্লুর মতোই এই রোগও সর্দি-কাশির ড্রপলেট বা কণার মাধ্যমে অন্যকে সংক্রমিত করে। এছাড়া ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শও এড়িয়ে চলতে হবে। অসুস্থ পশুপাখির থেকে দূরে থাকতে হবে।

রুমাল বা টিস্যু পেপার হাতে না থাকলে, মুখে হাত চাপা দিয়ে হাঁচা বা কাশা উচিৎ নয় কারণ সেই হাতে অন্য কিছু স্পর্শ করার সম্ভাবনা থাকে। পরিবর্তে কনুই-এর কাছে বা কাঁধের কাছে মুখ গুঁজে হাঁচলে বা কাশলে সেই সম্ভাবনা কম।

হাঁচি বা কাশির সময়, টিস্যু পেপার ব্যবহার করার পর ওই টিস্যু পেপার যেখানে সেখানে না ফেলে, কোনও নির্দিষ্ট ঢাকনা দেওয়া ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।

খাবার রান্নার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে তা সুসিদ্ধ হয়।

ভিড় থেকে দূরে থাকতে হবে। যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে লোকজমায়েত বন্ধ রাখতে হবে। সম্ভব হলে বাড়ি থেকেই অফিসের কাজ করতে হবে। একেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বা সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং বলে।

নিজেকে অসুস্থ মনে হলে ঘরে থাকতে হবে। বাইরে যাওয়া অত্যাবশ্যক

হলে নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। তবে বেশী অসুস্থ বোধ করলে, জ্বর হলে, কাশি বা শ্বাসকষ্ট হলে দ্রুত নিকটস্থ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজন বুঝলে পরীক্ষা করাতে বলবেন। অর্থাৎ নিজের উপসর্গ সম্পর্কে নিজে সচেতন হয়ে, প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতেহবে ও বাড়িতেও অন্য সদস্যদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে (সেল্ফ আইসোলেশান) বা ডাক্তারের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে (সেল্ফ রিপোর্টিং)।

জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বিদেশভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণের ক্ষেত্রে জরুরি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

কেউ কোন কারণে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শ এসেছে জানতে পারলে, তার কোন উপসর্গ না থাকলেও তাকে ১৪ দিনের জন্য অন্যদের থেকে আলাদা থাকতে হবে। একেই বলে সেল্ফ কোয়ারেন্টিন।

কাউকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারও সঙ্গে হাত মেলানো (হ্যান্ড শেক) বা কোলাকুলি না করে নমস্কার করে অভিবাদন জানাতে হবে।

সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া জরুরি

আগেই বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাসের গঠন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রধানত তিনটে উপাদানে গঠিত এই নভেল করোনাভাইরাস। সবচেয়ে বাইরের অংশে থাকে গ্লাইকোপ্রোটিনের কাঁটা যেগুলোর সাহায্যে ভাইরাসটা জীবন্ত কোষে আটকে গিয়ে সংক্রামিত হয়। দ্বিতীয় উপাদানটা হ'ল রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আরএনএ (RNA)। যখন কোনও জীবন্ত কোষের ভিতরে ভাইরাসটি ঢোকে, তখন সে বংশ বিস্তার করে আরএনএ-র প্রতিলিপি তৈরির মাধ্যম। আর তৃতীয় উপাদানটা হ'ল একটা লিপিড স্তর, এটা ভাইরাসের অন্যান্য অংশকে ধরে রাখে। এই লিপিড স্তরটাকে ভাঙ্গতে পারলে ভাইরাসটাকে মারা সম্ভব।

সাবানের আণবিক গঠন দেখলে বোঝা যায় যে, এদের একটা মাথা এবং একটা লেজ আছে।

সাধারণত মাথাটা হাইড্রোফিলিক (hydrophilic), অর্থাৎ মাথাটার জলের অণুগুলোর প্রতি আকর্ষণ প্রবল। লেজটা আবার হাইড্রোফোবিক (hydrophobic), অর্থাৎ লেজটা জলকে একেবারেই পছন্দ করে না। এবার সাবান আর জল দিয়ে হাত ধুলে ভাইরাসের লিপিড স্তরের প্রতি জলে গোলা সাবানের অণুর লেজের আকর্ষণ প্রবল হয়। অন্য দিকে জলের অণু আবার সাবানের অণুর মাথাকে আকর্ষণ করে। এই টানাপড়েনের মধ্যে পড়ে ভাইরাসের লিপিড স্তরটা ভেঙে যায়, ফলে ভাইরাসটা নিষ্ক্রিয় হয়ে মারা যায়।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার থেকে সাবান বেশি কার্যকরী

স্যানিটাইজারের মূল উপাদান হল অ্যালকোহল। অ্যালকোহলও করোনভাইরাস-এর লিপিড স্তরটা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম। কিন্তু সাবানের মতো ভাইরাসের লিপিড স্তরের সঙ্গে অ্যালকোহলের দ্রুত বন্ধন তৈরী হয় না, যার ফলে স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হতে সময় লাগে। তাই হ্যান্ড স্যানিটাইজারের থেকে সাবান ভাইরাস নষ্ট করতে বেশি কার্যকরী। সাবান ও জল ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে তখন হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিকল্প হতে পারে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি

কোভিড -১৯ সংক্রমিত হওয়া এবং ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধের জন্য আপনাকে সাধারণ কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরী। যেমন, ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার করুন, আপনার যদি করোনাভাইরাস বলে মনে হয় তবে পরীক্ষা করুন, যেকোন রকম জনসমাগম এড়িয়ে চলুন, ৬ ফুট শারীরিক দুরত্ব রক্ষা করে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন, কিছুক্ষন পর পর সাবান জল বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে আপনার হাত পরিষ্কার করুন, ঘন ঘন স্পর্শকৃত পৃষ্ঠগুলি জীবাণুমুক্ত করুন।

হোম কোয়ারেন্টাইন

ভাইরাসটির সংক্রমণ রোধে সারা বিশ্বে হোম কোয়ারেন্টাইনের ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশে জরুরী আইন, কারফিউ, লকডাউন, সরকার ছুটি ইত্যাদি ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো - প্রতিটি বাড়ির প্রতি জনকে ঘরের মধ্যে পারবারিক পরিবেশে ঘরোয়াভাবে থেকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা। বৃহৎ আকারে সমাজের প্রতিটি লোককে সংযুক্ত করা যায় বলে এটি ভাইরাস সংক্রমণ রোধের সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। এখানে ভাইরাস আক্রান্ত কেউ নির্ধারিত সময় কোয়ারেন্টাইনে থাকলে সে দ্রুততম সময়ে সেরে উঠার পাশাপাশি ঘরের ভিতরে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলায় পরিবারের অন্যদের সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

এখানে নিয়ম হলো

- প্রত্যেকে আলাদা কক্ষ ব্যবহার করা এবং আলাদা বাথরুম ব্যবহার করা।
- কোনো বাড়িতে লোকজন বেশি থাকলে খাট, মেঝে, বারান্দা মিলে তিন ফুট দূরে দূরে থাকলে সামাজিক দূরত্বের বিষয়টিও মিটে যায় এবং সম্ভব হলে আক্রান্ত ব্যক্তি সবার পরে টয়লেট ব্যবহার করবে এবং ব্যবহার শেষে প্রচুর পানি ঢালবে ও ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবে।
- বাড়ির বয়স্ক ও বার্ধক্যজানিত অসুস্থ লোকদের দিকে বেশি নজর রাখা উচিত। কেউ বেশি অসুস্থ হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারে এবং সেখানে কোয়ারেন্টাইনে যেতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে অন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিতে পারে।
- বিশেষ করে যারা সম্প্রতি যারা বিদেশ থেকে দেশে এসেছে অথবা তার সংস্পর্শে এসেছে অথবা দেশের ভেতরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল করেছে তাদের স্বেচ্ছায় হোম কোয়ারেন্টানে যাওয়া উচিত।

দেশের আনাচে কানাচে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিজন আক্রান্ত রোগীকে ভাইরাস মুক্ত করতে এবং সংক্রামণ রোধে একসঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সুযোগ করে দেয় বিধায় হোম কোয়ারেন্টাইনের বিষয়টি অনেক গুরুত্ব বহন করে। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অফিসিয়াল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়া যেমন- টেলিফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ও জরুরী অফিসিয়াল কাজগুলো করতে পারে। একান্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া পরিহার করা উচিত, কোন বিশেষ কারণে বাইরে গেলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাসায় প্রবেশ করবে।

মনে রাখতে হবে, হোম কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া কোন লজ্জার বিষয় নয় বা সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার কিছু নয় বা এটিকে জেলে আবদ্ধ থাকার মতো মনে করার বিষয় নয়। এখানে নিজে যেমন সুস্থ হওয়া যায়, তেমনি নিজের আপনজন তথা দেশবাসীকে সুস্থ রাখার সুযোগ করে দেয়া যায়। অন্যদিকে কেউ হোম

কোয়ারেন্টাইন না মানলে নিজের জীবন যেমন ঝুঁকিতে ফেলে দেয়, তেমনি অন্যের জন্যও হয়ে দাঁড়ায় প্রত্যক্ষ ঝুঁকির কারণ। তাই প্রতিটি নাগরিকের উচিত হোম কোয়ারেন্টাইনের কর্মসূচী যথাযথভাবে পালন করে নাগরিক হিসেবে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া।

লকডাউন

কোন এলাকায় করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেলে, করোনা পরীক্ষার রিপোর্টে বেশি ধরা পড়লে বা করোনা রোগীর মৃত্যু সংখ্যা বেশি হলে ঐ এলাকা লকডাউন ঘোষণা দেয়া হয়। লকডাউন চলাকালীন সময়ে উক্ত এলাকায় বাইরের কোনো লোকের প্রবেশ এবং উক্ত এলাকার ভেতরের লোকদেরও বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। আর ঐ এলাকার লোকদের মনে করতে হবে যে, তারা মহামারী প্রাদুর্ভাবের কিনারায় রয়েছে। তাই ওই এলাকার প্রতিটি লোকের এবং সবার উচিত সচেতনতার সাথে হোম কোয়ারেন্টাইন কর্মসূচী বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন করা। নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে না বেরোনো ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা, গণ জমায়েত ইত্যাদি পরিহার করা।

লকডাউন বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য অনেক সময় আইনশৃখলা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আইন শৃখলা বাহিনীর কর্তব্য লোকজনকে শৃখলা মানতে বাধ্য করা, গণজমায়েত রোধে ব্যবস্থা নেয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে বাধ্য করা ও এগুলোর প্রয়োজনীয়তা বোঝানো ও মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।

এই ভাইরাসটি আক্রান্ত রোগী থেকে সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে ছড়ায়। অনেক সময় আক্রান্ত রোগীর কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রোগটি যেহেতু অতি ছোঁয়াচে তাই জনসমাবেশে গেলে সে নিজের অজ্ঞাতেই অনেককে সংক্রমণ করে ফেলতে পারে। এজন্য যেভাবেই হোক রোগী, সুস্থ ব্যক্তি সবাইকে গণজমায়েত যেমন- হাট-বাজার, সুপার মার্কেট, ধর্মীয় উপাসনালয় ইত্যাদি জায়গায় যাওয়া হতে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

করোনাকালে গুজব

এই মহামারীর সময়ে এই ভাইরাস নিয়ে দেশের আনাচে কানাচে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে দিতে দেখা যায়। যেমন- থানকুনি পাতা, গায়েবি ওষুধ, বিভিন্ন হারবাল ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন গুজব বাজারে আসে। তাছাড়া অনেক ব্যক্তির ও অনেক অসমর্থিত প্রচার মাধ্যমেও অনেক ভিত্তিহীন খবর চলে আসে। এগুলোতে সাধারণ জনগণ বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হয়, অনেক সময় অপচিকিৎসার খপ্পরে পড়ে। তবে সত্যিকার মূলধারার প্রচার মাধ্যমগুলোর এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং তারা সঠিকভাবে নজরে আনায় এগুলো অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব।

করোনা হলে আতঙ্ক নয়

কেউ সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হলেই তার করোনা হয়েছে, এটা মনে করা সমীচীন

নয়। কেননা ঋতু পরিবর্তনের সময় কমন ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তবুও এ লক্ষণ দেখা দিলে উক্ত রোগীকে সর্তকতামূলক নিজ থেকেই কোয়ারেন্টানে থাকা উচিত। কোনভাবেই আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। আর দশটা ফ্লু অসুখের মতো করোনা ভাইরাস অসুখটিও আপনা আপনি (৮০-৯০%) সেরে যায়। মৃদু লক্ষণ থাকলে বাড়িতে বসে সংক্রমণের চিকিৎসা নেয়া অথবা হেল্প লাইন-এর মাধ্যমে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। আর জটিল হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে চিকিৎসা নিতে পারেন। তাকে বুঝতে হবে যে, এই দুঃসময়ের মধ্যেও চিকিৎসাযন্ত্রের সব ব্যবস্থা তার জন্য খোলা আছে এবং তাকে অসহায় বলে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। আর এই অসুখটি নিয়ে লুকানোর কিছুই নেই অথবা অসুখটি নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো উচিত হবে না, কেননা এ ক্ষেত্রে সে নিজে যেমন চিকিৎসা সুবিধা থেকে একদিকে বঞ্চিত থাকবে অন্যদিকে যত্রতত্র ভাইরাসটি ছড়িয়ে বেড়াবে। অসুখটি যেহেতু অতি ছোঁয়াচে তাই তাকে কোয়ারেন্টাইন বিধিমালা সর্তকভাবে মেনে চলতে হবে, তাকে বুঝতে হবে যে হেলাফেলা করলে তার নিজের পরিবারেরই কেউ আক্রান্ত হয়ে জটিলতায় ভুগতে পারে। আত্মীয়স্বজন ও সমাজের অন্যদের উচিত কেউ করোনা আক্রান্ত হলে তার সাথে আন্তরিক ব্যবহার করা, তাকে মানসিভাবে আশ্বস্ত করা ও রোগটির গতিবিধি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা আর হোম কোয়ারেন্টানে থাকার জন্য উপদেশ দেয়া প্রয়েজনে চিকিৎসার জন্য সহায়তা করা।

করোনা ও হৃদরোগ

২০২০ এর শুরুর দিকে, যখন আমরা সম্ভাব্য গুরুতর পরিণতি সহ একটি নভেল করোনভাইরাস সম্পর্কে শুনেছিলাম, তখন এটি সম্পর্কে আমাদের জানা এবং কী করা উচিত তা শেখার জন্য দৌড় শুরু হয়েছিল। খুব বেশি দিন আগের কথা নয় এবং এখনও অনেক কিছু আবিষ্কার হওয়ার পরেও, একটি দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা উদ্ভূত হয়েছিল - হৃদরোগের মতো অন্তর্নিহিত সমস্যা সম্বলিত রোগীদের জন্য কোভিড - ১৯ একটি বিশেষ ঝুঁকি সৃষ্টি করে, যা ইতিমধ্যে বর্তমান বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান কারণ।

এছাড়াও উদ্ভূত হওয়া উদ্বেগজনক প্রবণতা ছিল যে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীরা, যারা সাধারণত নিয়মিত পরিষেবা নেয়ার কথা বা কোভিড-এর সাথে সম্পর্কিত নয় এমন সমস্যাগুলির জন্য জরুরি পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেসের প্রয়োজনে, তারা হাসপাতাল এবং ডাক্তারদের এড়িয়ে চলছিলেন। শুধু আমাদের দেশ নয় সারা পৃথিবীজুড়েই বিভিন্ন দেশগুলি এই নাটকীয় অবস্থার সম্মূখীন হয়, এবং এই অবস্থার জন্য ভাইরাস সংক্রমণের ভয়কেই দায়ী করা হয়।

কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস রোগের মূল "গুরুতর তীব্র শ্বসনতন্ত্র সিনড্রোম-করোনাভাইরাস-২" (SARS-CoV-2) রোগের যত রকম জটিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তত বিচিত্র উপায়ে জীবন সংহার করছে। এটি অত্যন্ত সংক্রমণযোগ্য এবং বিভিন্ন ধরণের তীব্রতার সাথে আঘাত করে।

কোভিড-১৯ ও হৃদরোগের আন্তসম্পর্ক

কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ (সিভিডি) বা হৃদরোগীরা মারাত্মক কোভিড-১৯ -এর প্রতি বেশি সংবেদনশীল। হার্টের কোনও না কোনও অবস্থা বা কাজকে প্রভাবিত করে এমন রোগগুলির মধ্যে রয়েছে হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস, অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম, হৃৎপিন্ডের পেশীগুলির টিস্যুগুলিতে ক্ষত (মায়োকার্ডিয়াল ইনজুরি), হার্ট ফেইলিউর এবং কম শোনা যায় তবে রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ এবং চ্যাগাস রোগের মতো প্রচলিত রোগগুলিও আছে। এই সকল হৃদরোগের মতো অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য অবস্থার লোকেরা কোভিড-১৯ এর ঝুঁকিতে বেশি ।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে হার্টের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিভিন্ন গবেষণায় এটা প্রমানিত যে, কোভিড আক্রান্ত শতকরা ৫৫ জন রোগীরই তাদের হার্টের পাম্প করার ক্ষমতারবেশ অস্বাভাকি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং ধারনা করা হচ্ছে আগামী বছরে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের হৃদরোগের “এক্সপোনেনসিয়াল গ্রোথ” বা যাকে বলে ব্যাখ্যা মূলক বৃদ্ধি দেখা দেবে। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে এটাও বলা হয়েছে যে, এই মহামারীর কারণে হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা নেওয়াও বিলম্বিত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিড আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শতকরা ২৮ জনের হার্টের মায়োকার্ডিয়ামের ইনজুরি বা মাংশপেশীতে ক্ষত হয়যদিও এদের মধ্যে অনেকেরই আগে থেকেই হার্টের নানা রকম সমস্যা ছিল। শিশুদের হার্টেও এরকম ক্ষত দেখা দিতে পারে। সম্প্রতি দুই মাস বয়সী কোভিড আক্রান্ত এক শিশুর হার্টের মাংশপেশিতে এরকম ক্ষত এবং এর কারণে হার্ট ফেইলিউরের ঘটনা দেখা গেছে।

হার্ট অ্যাটাকের ছদ্মবেশে করোনার হানা

চীন থেকে শুরু করে এই ভাইরাসের প্রকোপে এখন চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে বিশ্বের ১৮৫টি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। গোটা বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫ কোটি। এই ভাইরাসের প্রকোপে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২০ লক্ষ জনেরও বেশি মানুষের।

প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাসের ‘ছদ্মবেশ’! শুনতে অবাক লাগলেও ইদানীং এমন অনেক ঘটনা সামনে এসেছে যেখানে হৃদরোগের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীর মধ্যে হৃদযন্ত্রের সমস্যা নয়, মিলেছে করোনাভাইরাসের উপস্থিতির প্রমাণ! যা চমকে দিয়েছে খোদ চিকিৎসকদেরও।

হৃদরোগের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীর হৃদযন্ত্রে কোথায় সমস্যা হয়েছে তা জানার জন্য প্রাথমিক ভাবে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি বেশ কয়েকটা ঘটনায় দেখা গিয়েছে, অ্যাঞ্জিওগ্রামের রিপোর্টে হৃদযন্ত্রের কোনও ব্লক বা সমস্যাই ধরা পড়েনি। এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ওই রোগীর হৃদযন্ত্রের

পেশীতে সংক্রমণ ছড়ানোর কারণেই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সমস্যা এবং একই সঙ্গে বুকে ব্যথা হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে ওই রোগীর হৃদযন্ত্রের পেশীতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে।

সমস্যা এখানেই। যে সমস্ত চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনাভাইরাসের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা রোগী দেখার ক্ষেত্রে সুরক্ষা বিধি মেনে পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদি ব্যবাহার করে যে সাবধানতা নিচ্ছেন, হৃদরোগের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীরা সে ভাবে প্রস্তুত থাকছেন না। রোগীকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছেন তাঁরা। কিন্তু একাধিক পরীক্ষার পর যতক্ষণে তাঁরা বুঝতে পারছেন যে রোগীর হার্ট অ্যাটাক নয়, হৃদযন্ত্রের পেশীতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে, ততক্ষণে হয়তো অনেকের শরীরে সংক্রমিত হয়ে যাচ্ছে এই ভাইরাস। একে বলে ‘মায়োকার্ডাইটিস’ (Myocarditis)। আমেরিকা ও ইতালিতে অসংখ্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এ ভাবেই আক্রান্ত হয়েছেন করোনাভাইরাসে। করোনাভাইরাসের এই ‘ছদ্মবেশ’ বিপদ বাড়াচ্ছে হৃদরোগের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের।

মায়োকার্ডাইটিস কী?

মায়োকার্ডাইটিস হল ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণে যখন হৃদযন্ত্রের পেশী আক্রান্ত হয়, তখন তা সঠিক ভাবে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হতে পারে না। ফলে বুকে ব্যথা বা হার্ট অ্যাটাকের মতো লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই এ ক্ষেত্রে অ্যাঞ্জিয়োগ্রামের রিপোর্টে হৃদযন্ত্রের কোনও ব্লক বা সমস্যাই ধরা পড়ে না যা হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ।

কী ভাবে হৃদযন্ত্রের পেশীতে সংক্রমিত হচ্ছে করোনাভাইরাস?

যাঁদের হৃদরোগের সমস্যা রয়েছে, যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে, যাঁদের আগেই বাইপাস সার্জারি হয়েছে বা স্ট্রোক হয়েছে এমন মানুষ যদি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন, সে ক্ষেত্রে প্রাণহানির আশঙ্কা অনেকটাই বেশি। তবে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হল মায়োকার্ডাইটিস বা হৃদযন্ত্রের পেশীতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের জেরে হওয়া সমস্যা। তবে কী ভাবে হৃদযন্ত্রের পেশীতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটছে, তা নিয়ে এখনও গবেষণা চালাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

শরীরে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হলে হার্ট অ্যাটাক, অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি বা হার্ট ফেলিওর পর্যন্ত হতে পারে।

হৃদরোগীদের করোনা হলে বিপদ বেশী

আগে থেকে যাদের হৃদরোগ আছে তারা করোনা আক্রান্ত হলে অবশ্যই তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মোটামুটি ঠিক থাকলে আর পাঁচজনের যতটুকু ভয়, হৃদরোগীদের ভয়ও প্রায় ততটুকুই। তবে রোগ একবার হলে বিপদ আছে। কারণ যে মাত্রার সংক্রমণ একজন কমবয়সি ও সুস্থ সবল মানুষ অবলীলায় সামলে নিতে পারেন, সেই একই সংক্রমণ জটিল হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

ঝুঁকি কাদের বেশি

- যাঁদের হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কম।
- পেসমেকার আছে বা ভাল্‌ভ পালটানোর অপারেশন হয়েছে।
- যাদের হৃদরোগের রিস্ক ফ্যাক্টর, অর্থাৎ বেশি ওজন, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপানের অভ্যাস ইত্যাদি আছে।
- একাধিক রিস্ক ফ্যাক্টরের সঙ্গে হৃদরোগও যদি থাকে, বিপদ দ্রুত বাড়াবাড়ি রূপ নিয়ে নিতে পারে।

আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজির রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, সাধারণ কোভিড রোগীদের মধ্যে যেখানে মৃত্যুহার ২.৩ শতাংশ, হৃদরোগ আছে এমন কোভিড রোগীর ক্ষেত্রে তা পৌঁছে যায় ১০.৫ শতাংশে। আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার ১১টি দেশের ১৬৯টি হাসপাতালে ভর্তি ৮৯১০ জন রোগীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে বস্টনের ব্রিগহাম ও ওমেনস হাসপাতালের চিকিৎসকেরা দেখেছেন, এঁদের মধ্যে যে ৫১৫ জন মারা গেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছেন বয়স্ক ও হৃদরোগীরা। ৬৫-র চেয়ে বেশি বয়সি মানুষের মধ্যে মৃত্যুহার ১০ শতাংশ, বয়স বেশি নয় কিন্তু করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে এমন রোগীদের মধ্যে মৃত্যুহার ১০.২ শতাংশ, হার্ট ফেইলিউরের রোগীদের ১৫.৩ শতাংশ, অ্যারিদমিয়ার রোগীদের মধ্যে ১১.৫ শতাংশ।
আরও বিশদ খবর পাওয়া যায় 'জার্নাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, কার্ডিওলজি'-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। চীনের একটি হাসপাতালে সমীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন, হৃদরোগ আছে এমন কোভিড রোগী, যাঁদের রক্তে ট্রপোনিন লেভেল বাড়েনি, তাঁদের মৃত্যুহার যেখানে ১৩ শতাংশ, যাঁদের ট্রপোনিন বেড়েছে, তাঁদের মৃত্যুহার হয়ে গেছে ৬৯ শতাংশ। ট্রপোনিন হল সেই কার্ডিয়াক এনজাইম, যার মাত্রা হার্টের পেশি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে। অর্থাৎ কোভিডের প্রভাবে হার্টের ক্ষতি হয়।

কোভিড-১৯ হার্টের কি ধরণের ক্ষতি করে?

আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে বিজ্ঞানীরা জানান, রেসপিরেটরি ভাইরাস বলে করোনা ফুসফুসের উপরই বেশি আক্রমণ শানাবে বলে ভাবা হয়েছিল, কিন্তু যত দিন গেল, বোঝা গেল, রোগ জটিল হতে শুরু করলে তার প্রভাব পড়ে শরীরের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গেই। এমনকি, কিছু ক্ষেত্রে ফুসফুসে জটিলতা দেখা দেওয়ার আগেই হার্ট আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে আগে থেকে হৃদরোগ থাকলে বেশি সমস্যা হয়। না থাকলেও হতে পারে। কারণ, হার্ট ও ফুসফুস শরীরে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একে অপরের উপর নির্ভরশীল বলে একজনের ক্ষতি হলে তার প্রভাব পড়ে অন্যের উপর। যাঁদের হার্ট দুর্বল, তাঁদের হার্টের্র ক্ষতি বেশি হয়। দুর্বল ফুসফুসের প্রভাবও হার্টে গিয়ে পড়ে।

ভাইরাস যদি হার্টের পেশিতে সংক্রমণ ছড়ায়, যাকে বলে ভাইরাল মায়োকার্ডাইটিস, তাহলে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কমে যায়। তখন তিন রকম পরিস্থিতি হতে পারে। যেমন-

- হার্ট ফেইলিউর হতে পারে। যাঁদের বয়স ৬৫-র বেশি, আগে থেকে হার্ট ফেইলিউর আছে বা কোনও কারণে হার্ট দুর্বল, তাঁদের তাড়াতাড়ি হয়। অন্যদেরও হতে পারে। পরিস্থিতি অবনতি হলে রোগী মারা যেতে পারে।
- কারও হৃৎস্পন্দন খুব কমে যায়, কারও খুব বেড়ে যায়। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে।
- যাঁদের ইস্কিমিক হৃদরোগ আছে, তাঁদের হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় আবার হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ দেখা দিলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার চিহ্ন দেখা যায় না। ক্রিটিকাল কেয়ার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, "কোভিডের বাড়াবাড়ি হলে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বেড়ে গিয়ে এমন পরিস্থিতি হয় যে হার্টের ধমনির পথ অবরুদ্ধ না হলেও, সেরকম উপসর্গই হয় অনেকটা।"

কতটা ক্ষতি?
"কার কী উপসর্গ হবে, কতটা ক্ষতি হবে, বাঁচানো যাবে কি না, তা নিভ্র্র করে রক্তেট্রপোনিনের মাত্রার উপর। ভাইরাল মায়োকার্ডাইটিস হলে রক্তে এর মাত্রা বাড়তে থাকে। হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর, অ্যারিদমিয়া, সব কিছুরই আশঙ্কা বাড়ে। এর সঙ্গে যদি নিউমোনিয়া বাড়ে, ফুসফুস ঠিক ভাবে

অক্সিজেনের জোগান দিতে পারে না। ফুসফুসের কার্যকারিতা তলানিতে চলে এলে, যাকে বলে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম, এরকম অবস্থায় ৬০-৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসায় কোনও ফল হয় না।"

করোনাকালে মানসিক দুশ্চিন্তায় হার্ট অ্যাটাক

মূলত তিনটি কারণে যখন তখন হৃদরোগ হতে পারে। যেমন:

- কোলেস্টরেল বেড়ে গেলে
- ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়ে গেলে
- ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে না থাকলে

প্রসঙ্গত, 'দ্য লানসেট' নামক আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক জার্নালের একটি প্রতিবেদনে গবেষকরা দাবি করেছেন, বাড়তে থাকা স্ট্রেসও এবং চাপা উদ্বেগও হৃদরোগের একটি কারণ হয়ে উঠতে পারে।

সমস্ত হার্ট অ্যাটাক কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে পর্যবসিত হয় না। কোনও রোগীর ধমনী ব্লক হয়ে গেলে অক্সিজেনপূর্ণ রক্ত হৃৎপিন্ডে পৌঁছনো বন্ধ হয়ে যায়। তখনই হয় হার্ট অ্যাটাক। দ্রুত চিকিৎসা শুরু না হলে হৃৎপিন্ডের সেই অংশটি অকেজো হয়ে যায়। বিপদ এড়াতে জীবনযাপনের বিষয়ে সতর্ক হওয়া জরুরি।

বায়ুদূষণে বাড়ছে হৃদরোগের আশঙ্কা

বায়ুদূষণ হৃদরোগের অন্যতম কারণ এবং বৈশ্বিক রোগের বোঝা বৃদ্ধিতেও বিরাট সংযোজন। বায়ুদূষণের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানের কারণে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুঝুঁকি বৃদ্ধিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ আছে।

হৃদরোগ বিষয়ে নিয়ে কাজ করা বিশ্বের প্রধান চারটি নেতৃস্থানীয় সংগঠণ্‌ ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন, আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলোজি, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলজি এক যৌথ ইশতেহারে সারা বিশ্বের মেডিকেল কমিউনিটি এবং স্বাস্থ্যনেতৃবৃন্দের কাছে সারা বিশ্বের মানুষকে বায়ুদূষণের মারাত্মক প্রভাব থেকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছে।

২০১৯ সালে সারা বিশ্বে ৬৭ লক্ষ মানুষ অর্থাৎ সকল মৃত্যুর শতকরা ১২ ভাগ মৃত্যুই হয়েছে বায়ু দূষণের কারণে। এবং এর অর্ধেকেরও বেশী মানুষের মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে। বায়ু দূষণ হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগের ঝুঁকিও বাড়ায় এবং এই রোগগুলিই করোনা আক্রান্তের পরিনতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যায়।

এটা ঠিক যে, করোনা মহামারীর পূর্বেও বায়ু দূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য ছিল বিরাট ঝুঁকির কারণ। নভেল করোনার মহামারীর প্রকোপে কয়েকদিনের জন্যে হলেও বায়ুদূষণের সমস্যা কিছুটা কমেছিল। কিন্তু বর্তমানে আবারও শুরু হয়েছে দূষণ।

সর্দি-কাশি-শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে অ্যালার্জি, এমনকি হৃদরোগেরও অন্যতম কারণ দূষণ। সম্প্রতি 'কারেন্ট সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র বলছে, পরিবেশ দূষণের কারণে অন্য অসুখবিসুখের পাশাপাশি বাড়ছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের গতি। এর অর্থ, রক্তবাহী ধমনীতে চর্বি জমে রক্ত চলাচল কমে যাওয়া। "স্বাভাবিক নিয়মে বয়স বাড়লে, ওজন বেশি হলে এবং ভুল খাদ্যাভ্যাসের ফলে অ্যাথেরোসেক্লরোসিস হয় ঠিকই। কিন্তু দূষণ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের গতি আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে হৃদরোগ ও ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।"

বিশ্বব্যাপী সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, প্রতি ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ২,৭৫০ জন মারা যান পরিবেশ দূষণজনিত নানা শারীরিক সমস্যায়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে বাতাস, শব্দ-সহ অন্যান্য দূষণ মানুষ ও পরিবেশের অন্য প্রাণীদের উপর কতটা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। গাড়ি ও কারখানার ধোঁয়ার পাশাপাশি বাড়িতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত উনুন বা কেরোসিন স্টোভের ধোঁয়াও আমাদের হৃদপিন্ড, ফুসফুস-সহ সামগ্রিক শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। 'জার্নাল অব আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি'-তে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, একটানা দূষিত পরিবেশে থাকলে কয়েকদিনের মধ্যেই ১০০ জনের মধ্যে ৩ জনের হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে।

মূল শত্রু সূক্ষ্ম ভাসমান কণা

বাতাসে ভাসমান পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম বা সূক্ষ্ম ভাসমান কণা) শারীরিক সমস্যার অন্যতম কারণ। "গাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়ার পাশাপাশি জ্বালানির ধোঁয়াতেও থাকে সূক্ষ্ম ভাসমান কণা। এগুলির মধ্যে অনেক ভাসমান কণা আছে যেগুলি অত্যন্ত ছোট্ট (২.৫ মাইক্রন)। বিপদ ডেকে আনে এরাই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের

সময় এই ভাসমান কণাগুলি শ্বাসনালী দিয়ে সরাসরি শরীরে প্রবেশ করে। দূষিত বাতাসের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকলে ১০০ জনের মধ্যে ১০ জনের হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে। এঁদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক বেশি।"

পিএম ছাড়াও দূষিত বাতাসে থাকে নাইট্রোজেন, সালফার ও কার্বন মনো-অক্সাইড। এই রাসায়নিকগুলি মানুষের শরীরের রক্তবাহী ধমনীতে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের গতি বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে ধমনীর ভিতরে 'লাইনিং'-এর কার্যকারিতাকে নষ্ট করে। এর ফলে হৃদপিন্ড ও মস্তিষ্কের ধমনীতে কোলেস্টেরলের প্রলেপ জমে। ফলে প্রাথমিক ভাবে শ্বাসকষ্ট-সহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়। পরবর্তীকালে হৃদরোগ এবং ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। বাড়িতে কেরোসিন তেলের স্টোভে রান্না হলে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের ঝুঁকি বাড়ে প্রায় ১৫ শতাংশ।

উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে

অনেক ছবিতেই দেখা যায়, রেগে গিয়ে চিৎকার করতে করতে কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ঘটনাটা বাস্তবেও ঘটতে পারে। যাঁদের বাড়ির আশেপাশের বাতাস দূষিত, তাঁদের কোনও কারণ ছাড়াই রক্তচাপ বেড়ে যাবার ঝুঁকি থাকে। ওই ঝুঁকি আরও বেশি থাকে সে সব এলাকায়, যেখানে বাতাসে ভাসমান কণার পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগের পাশাপাশি ব্রেন স্ট্রোক ও ফুসফুসের সমস্যাও বাড়িয়ে দেয়। ফলে দূষিত অঞ্চলে বসবাসকারীদের হৃদরোগ হলে 'কার্ডিও-রেসপিরেটরি ফেইলিউর'-এর ঝুঁকিও বহুগুণ বেড়ে যায়। বিশেষত, যাঁরা উচ্চ রক্তচাপ এবং ইস্কিমিয়ায় আক্রান্ত।

বয়স্ক ও শিশুদের সমস্যাই বেশি

ঢাকা সহ বড় বা মাঝারি শহরের বাতাসে ভাসমাণ কণা বেশি থাকে। তাই ছোটদের শ্বাসনালীর সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। বিশেষত, যাঁরা বাড়ির একতলায় থাকেন, তাঁরা বেশি দূষণের শিকার হন। বয়স্কদের ঝুঁকি আরও বেশি। বেশি বয়সে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাওয়ায় বার বার সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। বাড়ে হৃদরোগ এবং ব্রেন স্ট্রোকের আশঙ্কাও।

লাউডস্পিকারের শব্দও ক্ষতিকর

যে কোনও উৎসবে বা অনুষ্ঠানের মধ্যেও তারস্বরে গান চালানো হয়। সেই শব্দদূষণ শরীর-মন দুয়ের জন্যই খারাপ। লাগাতার উঁচুমাত্রার শব্দ উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের রক্তচাপ আরও বাড়িয়ে দেয়। হার্ট ফেইলিউর এবং ইস্কিমিয়ার রোগীদের বিপন্নতা বাড়ে। কানেরও ক্ষতি হয়। অনেকেই বাড়িতে উচ্চগ্রামে টেলিভিশন চালান বা সাউন্ড সিস্টেম বাজান। সেই শব্দও 'হার্ট ফ্রেন্ডলি' নয় বলে অভিমত । মেজাজ চড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপ, রক্তে শর্করা সবই বাড়িয়ে দেয় উচ্চস্বরের গানবাজনা বা সিরিয়ালের ঝগড়াঝাটি।

করোনাকালে অনিয়মিত হৃদস্পন্দন ও হঠাৎ মৃত্যু

করোনা মহামারির সময় আচমকা হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনার কথা প্রায়শই শোনা যাচ্ছে। কোনও কোনও সময় অন্যান্য কারণ থাকলেও হৃদযন্ত্রের অনিয়মিত ছন্দ অনেক সময় আচমকা হার্ট অ্যাটাক ডেকে আনতে পারে।

হৃদযন্ত্র ঠিক ভাবে পাম্প করতে না পারলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রয়াজনীয় অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পায় না। সুস্থ মানুষের হৃদযন্ত্র এক মিনিটে ৭২ বার পাম্প করে অক্সিজেন যুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত শরীরের কোষে কোষে পৌঁছে দেয়। কিন্তু কখনও কখনও বিভিন্ন কারণে হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ছন্দ বেড়ে কিংবা কমে যেতে পারে। হৃদযন্ত্র ঠিক ভাবে পাম্প করতে না পারলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পায় না। ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিপদের ঝুঁকি বাড়ে প্রতি পদে। ডাক্তারি পরিভাষায় হৃদযন্ত্রের রিদমের গোলযোগের নাম 'অ্যারিদমিয়া' বা হার্টের ছন্দবৈকল্য।

সব থেকে মুশকিল হল, হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ছন্দ বাড়লে বা কমলে উল্লেখযোগ্য কোনও উপসর্গ না থাকায় এই ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায় না। আর শরীরে সে রকম কোনও কষ্ট না থাকায় বেশির ভাগ মানুষ ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। এর ফলে আচমকা বিপদে পড়তে হয়।

কোভিড-১৯ নিয়ে দেশ বিদেশের সাধারণ মানুষ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্রত্যেকেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় ১৭.৯ মিলিয়ন মানুষ হৃদযন্ত্রের অসুখে মারা যান। এঁদের সিংহভাগেরই অ্যারিদমিয়া অর্থাৎ অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের সমস্যা থাকে। যা কিনা হঠাৎ মৃত্যুর এক অন্যতম কারণ।

প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে প্রায় ৫ জনের হৃদযন্ত্রের ছন্দের গোলমাল আছে। বয়স ৬০ বছর পেরলেই এই সমস্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ৬০ উত্তীর্ণদের মধ্যে ২০ শতাংশ মানুষের হৃদযন্ত্র অস্বাভাবিক ছন্দে চলে। আর ৭০ বছর অথবা তারও বেশি বয়সে অ্যারিদমিয়া বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ শতাংশে। হার্ট অ্যাটাকের পর হৃদযন্ত্রের পেশি কিছুটা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় অ্যারিদমিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ব্যাপারটাকে অবহেলা করলেই যখন তখন রোগীর হৃদযন্ত্র থেমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। শুধুই যে বয়স্ক বা ডায়াবেটিস ও হাইপ্রেশারের রোগীদেরই আচমকা মৃত্যু এসে গ্রাস করছে তা নয়, ২৫-৩০ বছরের তরুণ-তরুণীরাও হঠাৎ বিপদে পড়ছেন। প্রাণহানিও ঘটছে। কম বয়সে এ রকম হলে বেশির ভাগ মানুষই গ্রাহ্য করেন না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সাডেন কার্ডিয়াক ডেথের সমস্যা প্রায় দ্বিগুন।

হৃদযন্ত্র প্রতি মিনিটে কমবেশি ৭২ বার পাম্প করে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম বা শরীরচর্চা করলে ৭২ বারের থেকে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন সামান্য কম-বেশি হতেই পারে। কিন্তু লাগাতার চলতে থাকলে শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে বিকল হতে শুরু করে।

হৃদস্পন্দন মিনিটে ৭২ বারের পরিবর্তে ১০০ বার বা তাঁর কাছাকাছি হলে ডাক্তারি

পরিভাষায় বলে ট্যাকিঅ্যারিদমিয়া আর ৬০ বার অথবা তারও কম হলে তাকে বলে ব্রাডিঅ্যারিদমিয়া। হৃদস্পন্দনের হার যদি ৪০-এর নিচে নেমে যায় অথবা ১৫০ হয়ে যায়, তাহলে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করে যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে রোগীর জীবন সংশয় হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অবশ্য অনেক সময় থাইরয়েড গ্রন্থির অতি সক্রিয়তার কারণেও হৃদযন্ত্রের ছন্দ বেড়ে যেতে পারে বলে রঞ্জন শর্মার অভিমত।

হার্ট অ্যাটাকের পর প্রায় ২৫ শতাংশ রোগীর অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের ঝুঁকি বাড়ে। এছাড়া হৃদযন্ত্রের জন্মগত ত্রুটি, ভাল্‌ভের অসুখ এবং করোনারি হৃদযন্ত্র ডিজিজের অত্যন্ত ভাল চিকিৎসা হলেও এদের অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের ঝুঁকি অনেক বেশি। ইসকিমিয়ার রোগীদের ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে রিদম ডিজঅর্ডার আছে। এঁদের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি । আবার যাঁরা নিয়মিত মদ্যপান করেন ও অতিরিক্ত পরিমাণে কফি পান করেন, তাঁদের অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের ঝুঁকি বাড়ে। ধূমপানও এই সমস্যার এক অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর। রক্তে শর্করার বাড়তি মাত্রা এবং উচ্চ রক্তচাপ হৃদযন্ত্রের ছন্দ ওলটপালট করে দিতে পারে। তাই এসব অসুখ থাকলে ডাক্তার দেখাতে ভুলবেন না। যাঁদের ইতিমধ্যে একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে, কিন্তু লকডাউনের কারণে চেক আপ করাতে পারছেন না বা দীর্ঘ দিন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ নেই তাঁদেরও হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। কিছু কিছু উপসর্গ দেখলে অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের আশঙ্কা করা যেতে পারে।

যে সব লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন

- বুক ধড়ফড় করা এই অসুখের অন্যতম লক্ষণ। তার সঙ্গে অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠলে বা শ্বাসকষ্ট হলে সে দিকেও নজর রাখতে হবে।
- অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের কারণে পায়ের পাতা, গোড়ালি ও পা ফুলে যায়, এছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে জল জমে ফুলে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।
- সারা দিনই ক্লান্ত লাগে, ঘুম পায়, কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করে না, একাগ্রতা কমে যায়।
- কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়। জোরে হাঁটা-চলায় অসুবিধে হয় এবং শরীরচর্চা করার ক্ষমতা ক্রমশ কমতে শুরু করে।
- কাশি ও বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়।
- শরীরে জল জমে দ্রুত ওজন বাড়তে থাকে।
- খিদে কমে যায় ও গা বমি ভাব থাকে দিনভর।

এসব উপসর্গ দেখলে অবশ্যই একজন কার্ডিওলজিস্টের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করা উচিত। অত্যাধুনিক কিছু ওষুধ, কার্ডিয়াক রিসিনকোনাইজিং ডিভাইস এবং এমআরআই কন্ডিশনড ইমপ্ল্যান্টেবল ডিফিব্রিলেটরের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। এদেশে অনেক মানুষ কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের সমস্যায় ভুগছেন। এঁদের হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি খুব বেশি। করোনা-মুক্ত থাকার সঙ্গে হৃদযন্ত্রকেও ভাল রাখুন।

করোনায় রক্ত জমাটবেঁধে বাড়ছে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি

গবেষণায় দেখা গেছে, করোনা আক্রান্তের এক পর্যায়ে রোগীর রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে। ফলে শরীরে অক্সিজেনের ব্যাপক ঘাটতির সৃষ্টি হয়। এক বা একাধিক শিরার গভীরে রক্ত জমাট বাঁধলে ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রেও মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণ-সংশয় দেখা দেয়! এই সমস্যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় পালমোনারি এম্বোলিজম (Pulmonary Embolism) বলা হয়। একইভাবে পায়ে রক্ত জমাট বাঁধলে (Thrombus) ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস বা DVT-এর সৃষ্টি হয়।

করোনাভাইরাস হল আরএনএ ভাইরাস যা মানুষের শরীরে 'ভাইরাল লোড' বাড়িয়ে দ্রুত সংক্রমিত হয় এবং একই সঙ্গে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অতিসক্রিয় করে দেয়। এর ফলে আক্রান্তের শরীরে তৈরি হয় কোয়াগুলেশন কাসকেড (Coagulation Cascade)। সহজভাবে বলতে গেলে, আমাদের শরীরের শিরা-ধমনীর বিভিন্ন অংশে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে । ফুসফুস, হৃদযন্ত্র এমনকি মস্তিষ্কেও রক্তের শিরা-উপশিরায় রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে। ফলে করোনা আক্রান্ত বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়েই দেখা যাচ্ছে, তাঁদের হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক

বা মারাত্মক শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মৃত্যু হচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে রোগীকে ভেন্টিলেশনে রেখেও বাঁচানো যাচ্ছে না।

কীভাবে বোঝা যাবে রোগীর শিরা-উপশিরায় রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করেছে?

এর জন্য রোগীর রক্তের ডি-ডাইমার পরীক্ষা করানো হয়। এই পরীক্ষা থেকেই বোঝা যায় রোগীর শিরা-উপশিরায় রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করছে কিনা। এছাড়াও প্রোথ্রম্বিন টাইম, রক্তে ফ্রিব্রিনোজেন লেভেল এবং প্লেটিলেট কাউন্ট করেও রক্ত জমাট বাঁধা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

এই ধরনের সমস্যায় রোগীকে বাঁচানোর উপায়

এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে রোগীকে তখন 'অ্যান্টি কোয়াগুলেশন'-এর ওষুধ দেওয়া হয়। এই ওষুধ প্রয়োগে আক্রান্তের শিরা-উপশিরায় রক্ত জমাট বাঁধতে পারেনা। তবে এই 'অ্যান্টি কোয়াগুলেশন'-এর ওষুধ সেই সব রোগীকেই দেওয়া যেতে পারে যাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। রোগী ভেন্টিলেশনে চলে গেলে এই সব ওষুধের তেমন কোনও ফল হয় না। তাই যথা সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসায় এই ধরনের সমস্যা নিরাময় করে রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব

করোনা রোগীর ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস

করোনা সংক্রমণ বাড়ার সাথে সাথে চলছে এই মারণ ভাইরাস নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সম্প্রতি গবেষণায় ধরা পড়েছে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া কোভিড রোগীদের ক্ষেত্রে বাড়ছে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস অথবা ভেনাস থ্রম্বো-এম্বলিজম (ভিটিই)-এর সম্ভাবনা।

দেহের ভেতরের শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে গেলে সেই গুরুতর অবস্থাকে বলে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস বা ডিভিটি। এই জমাট বাঁধা রক্ত ঢুকে পড়ে ফুসফুসে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে থাকা রোগীদের ভেনাস থ্রম্বো-এম্বোলিজম বা ভিটিই-র ঝুঁকি ১৮ থেকে ২৮ শতাংশ। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে রিসার্চ অ্যান্ড প্র্যাক্টিসেস ইন থ্রম্বোসিস অ্যান্ড হিমোস্টাসিস জার্নালে।

মোট ৫ হাজার ৯৫১ জন কোভিড রোগীকে পরীক্ষা করে গবেষণা চালানো হয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া করোনা রোগীদের ক্ষেত্রে ভিটিই-তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১৪ শতাংশ। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে থাকা রোগীদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ২৩ শতাংশ।

তবে শুধু ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিসই নয়, করোনা ভাইরাসের আক্রমণে নানা আনুষঙ্গিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে মানুষের শরীরে। এই নিয়ে বিগত কয়েক মাস ধরেই গবেষণা চলছে। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ বলছে, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ হার্টের অপূরণীয় ক্ষতি করে দিচ্ছে। এমনকি যাঁদের ক্ষেত্রে মৃদু সংক্রমণ হচ্ছে, তাঁদের হার্টেও ক্ষতি হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা বলছে রোগী করোনা আক্রমণ কাটিয়ে সুস্থ হয়ে যাওয়ার মাসখানেক পরেও হৃদযন্ত্রে প্রদাহ এবং ক্ষত থেকে যাচ্ছে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিডজয়ী রোগীদের রোগমুক্ত হওয়ার পরেও শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় হওয়া, এই সব হয়েই চলেছে। কারণ বিশ্লেষণে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর কার্ডিওভাস্কুলার বায়োলজির গবেষক চালর্স মুরি বলছেন, হার্টের পেশি- কোষ নতুন করে তৈরি হয় না, জন্মের সময় থেকে একই থাকে। তাই কোনও ভাবে এই কোষের ক্ষয়ক্ষতি হলে সারার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বললেই চলে, হার্টের যান্ত্রিক ক্ষমতা কমে যায়।

হ্যাপি হাইপক্সিয়া

কোভিড-১৯ এর কিছু কিছু রোগী এই রহস্যময় অথচ ভেতরে ভেতরে বিপদজনক এক ধরনের আপাত: লক্ষনহীন সমস্যায় ভুগে থাকেন। এটা শরীরের এক ধরনের নি:শব্দ অক্সিজেন স্বল্পতা যা রোগীর অজ্ঞাতসারে যে কোন মূহূর্তে দ্রুত খারাপের দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং এমন কি এই ধরনের অক্সিজেন স্বল্পতা রোগীর রক্তের জমাটবদ্ধতা জ্বনিত জটিলতার কারনে ফুসফুসের মহাধমণী ব্লক (Acute pulmonary embolism) হয়ে রোগীর হঠাৎ মৃত্যুও হতে পারে। এই ধরনের নীরব অক্সিজেন স্বল্পতা করোনাক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে একটা ইমারজেন্সি ওয়ার্নিং সাইন বা জরুরী সতর্কীকরন লক্ষন। বাস্তবে এটা কখনোই "হ্যাপি" অবস্থা নয়।

এই অবস্থার সত্যিকার যুক্তিযুক্ত নাম "Silent Hypoxia" বা নীরব অক্সিজেন স্বল্পতা । কারণ রোগীরা ভেতরে ভেতরে অক্সিজেন স্বল্পতায় ভুগলেও সহজে এটা অনুভব করতে পারে না। রক্তের অক্সিজেন স্যাচুরেশন অনেক কমে গেলেও রোগীরা ডাক্তারের সামনে স্বাভবিক আচরন করে, হয়তো দেখা যায় আত্নীয় স্বজনদের সাথেও স্বাভাবিক ভাবেই মোবাইলে কথা বলছে। আবার হঠাৎ করে যে কোন মূহূর্তে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

আমাদের শরীরে মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশে "Respiratory center" নামক একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্র যখন উদ্দীপিত হয়, তখন রোগীর শ্বাস নেওয়ার হার বাড়তে থাকে, রোগী ঘন ঘন নিশ্বাস নেয় এবং রোগী শ্বাস-কষ্ট বোধ করতে থাকে। মস্তিষ্কের এই শ্বাস কেন্দ্রকে শারীরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড নামক একধরনের বর্জ্য গ্যাস উদ্দীপিত করে। এই গ্যাস তখনই শুধুমাত্র শ্বাস কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করতে পারবে, যখন রক্তে এর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হবে।

সাইলেন্ট হাইপক্সিয়ার রোগীদের ক্ষেত্রে ফুসফুসের রক্ত সংবহনতন্ত্রে ছোট ছোট রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধে (Micro thrombi in pulmonary circulation)। একারনে যে পরিমান অক্সিজেন বাহিরের পরিবেশ থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে তার সবটুকু রক্তে শোষিত হয় না এবং এই ছোট ছোট রক্ত দলার কারনে রক্ত সংবাহিত হতে পারে না। এই অবস্থাকে বলা হয় "ventilation-perfusion mismatch"। এর সাথে আবার রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা কমে যায় বলে কোন কোন গবেষকের ধারনা। অক্সিজেনের পরিমান রক্তে কমে আসলেও কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা রক্তে স্বাভাবিক থাকে, কারন শিরা (venous system) দ্বারা প্রবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর কোন বাধা পেতে হয় না এবং ফুসফুসে পৌঁছার সাথে সাথেই তা প্রশ্বাসের মাধ্যমে বের হয়ে বাইরের বাতাসের সাথে মিশে যায়। এ অবস্থায় মস্তিষ্কের শ্বাস কেন্দ্র কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর মাধ্যমে উদ্দীপিত হয় না বলে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়েনা এবং সে কারনে অক্সিজেনের স্বল্পতা সত্ত্বেও রোগী কোন ধরনের শ্বাসকষ্ট বোধ করে না। তাই এটাকে সাইলেন্ট হাইপক্সিয়া বলা হয়ে থাকে।

আমেরিকার চিকিৎসকরা এই ধরনের অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন অনেক উচ্চতায় (high altitude) উড্ডন্ত বিমান চালনাকারী পাইলটের রক্তে অক্সিজেন স্যাচুরেশনের সাথে। যাদের অনেকের ক্ষেত্রে রক্তের অক্সিজেনের পরিমান কম থাকলেও তারা শ্বাসকষ্ট বোধ করে না। কারন তাদের ফুসফুস রোগাক্রান্ত নয়, তাই তাদের হাইপক্সিয়া দ্রুত অগ্রসরমান (rapidly progressive) নয়। কিন্তু কোভিড রোগীদের কারো কারো ক্ষেত্রে এই অবস্থা এতই জটিল আকার ধারন করে যে, সাইটোকাইন স্টর্ম নামের এক ধরনের দ্রুত অগ্রসরমান প্রদাহ ফুসফুসকে প্রচন্ড পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ করে (ARDS) এবং ফুসফুসের কার্যক্ষমতা একদম কমিয়ে ফেলে (Acute respiratory failure).

এই রকম সাইলেন্ট হাইপোক্সিয়াতে ভোগার পর প্রচন্ড শ্বাসকষ্টে (ARDS) মৃত্যু হয়েছে এমন কয়েকজন রোগীর অটোপসি রিপোর্টে ফুসফুসে রক্তের জমাটবদ্ধতা এবং প্রদাহের প্রমান মিলেছে।

সাইলেন্ট হাইপোক্সিয়াকে আগাম সনাক্ত করার নিমিত্তে অনেক রোগী এখন বাসায় পালস অক্সিমিটার ব্যবহার করছেন, যা দিয়ে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মনিটর করা যায়।

করোনায় সাইটোকাইন স্টর্ম

করোনাভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গগুলো সাধারণত দুটি কারণে প্রকট হয় বলে মনে করা হয়। একটি হলো- শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কমে যাওয়ার দরুণ এবং অপরটি হলো- সাইটোকাইন স্টর্ম।

সাইটোকাইন হলো একধরনের প্রোটিন। এরা রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থার অণুগুলোকে করণীয় সম্পর্কে সংকেত দেয়। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে দেহের রোগ প্রতিরোধী প্রতিক্রিয়া অনেক সময় মারাত্মক রূপে প্রকাশ পায়। এ সময় রক্তে প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইন নিঃসৃত হয়। এরা রোগ প্রতিরোধে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। আকস্মিকভাবে অতিরিক্ত সাইটোকাইন নিঃসরণ ঘটলে তাকে 'সাইটোকাইন স্টর্ম' বা সাইটোকাইন ঝড় বলে। এটা দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অতিমাত্রার প্রতিক্রিয়াও বলা যেতে পারে। অনেক সময় এর ফলে দেহে প্রদাহ বেড়ে যায়।

সাধারণত ফুসফুস, কিডনি, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও রক্তপ্রবাহে সাইটোকাইনের আধিক্য বেশি ঘটে থাকে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ফলে শ্বাসতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। করোনাভাইরাস তার আঁকশিগুলো ব্যবহার করে শ্বাসতন্ত্রের সেলের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং সেলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এভাবে সেলগুলোর মাধ্যমে ভাইরাস তার অনুলিপি তৈরি করতে থাকে। একের পর এক শ্বাসতন্ত্রের সেলগুলো আক্রান্ত হয়। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ফুসফুসের পাশাপাশি কিডনি, মস্তিষ্ক, লিভার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আক্রান্ত হয়। রক্তে অক্সিজেন সম্পৃক্ততা কমে যায়। এ অবস্থায় ভাইরাসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অভিযান হিসেবে সাইটোকাইন স্টর্ম ঘটতে পারে। এর পরিণামে অনেক সময় আক্রান্ত সেলগুলোই সাইটোকাইন স্টর্মের লক্ষ্যবস্তুতে

পরিণত হয়। এর ফলে রোগীর সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণের দুটো সমস্যার দিক রয়েছে। এর প্রথমটা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা। কোনো রোগীর যদি আগে থেকেই ডায়াবেটিস থেকে থাকে, বা কেমোথেরাপি নিতে হয়েছে, কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাহলে ভাইরাসের জন্য সেটা একটা পরম সুযোগ। ভাইরাস তাদের শরীরে প্রবলভাবে ছড়াতে থাকে, কারণ তাদের দেহে রাশ টেনে ধরার ক্ষমতা নেই।

দ্বিতীয় সমস্যাটা হলো "সাইটোকাইন স্টর্ম", যেটা সংক্রমণের ৮-১০ দিন পর থেকে শুরু হয়। আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতি-সক্রিয় ভাবে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করা শুরু করে দেয়। এই অতি-সক্রিয়তার দরুণ দেহে প্রদাহজনক ধারা (inflammatory cascades) তৈরি হয় আর তার ফলেই দেহের আরও ক্ষতি হয়। শরীরের 'স্ট্রেস রেসপন্স' সাধারণত এই অতি-সক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। কিন্তু যাদের শরীর আগে থেকেই অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত, তাদের দেহে এই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অনেক কম। কোভিড-১৯ এর সহযোগী রোগগুলির মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, কিডনীর রোগ, হাঁপানি এবং ক্যান্সার।

কোভিড -১৯ রোগীদের চিকিৎসার্থে বিশ্ব হার্ট ফেডারেশনের কিছু ব্যবহারিক প্রস্তাবনা

- কোভিড -১৯ রোগীদের রোগের তীব্রতার ভিত্তিতে যত্নের জন্য ট্রায়াজ করা বা মনোনীত করা দরকার যাতে পরিমিত এবং গুরুতর রোগের রোগীদের উপলব্ধ অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে একটি পৃথক ওয়ার্ড বা হাসপাতালে ভর্তি করা যায়।
- এছাড়াও, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, পূর্বের হৃদরোগ কিংবা ফুসফুসের রোগ, কিডনি ফেইলিউর এবং ক্যান্সারের মতো অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে রোগীদের অবস্থাও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে, যার ফলে কোভিড হওয়ার গুরুতর সম্ভাবনা রয়েছে এমন রোগীদের সনাক্ত করা যায়।
- কোভিড -১৯ এর লক্ষণযুক্ত যত্ন বাস্তবায়ন। ইনভেসিভ হার্ট পরীক্ষা করার জন্য ক্যাথেটারাইজেশন ল্যাবরেটরিসহ কোভিড -১৯ সংক্রমিত হৃদরোগী এবং কোভিড-১৯ আক্রান্ত নয় এমন হৃদরোগীদের মোকাবিলার জন্য পৃথক পৃথক সুবিধা রয়েছে তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

বিশ্ব হার্ট ফেডারেশনের মতে হৃদরোগ ও কোভিড -১৯ এর দ্বিমূখী আক্রমনের হুমকি মোকাবিলার উপায়

- সচেতনতা এবং প্রতিরোধ
- পুনরাশ্বাস

যাদের হৃদরোগের মতো অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্যের অবস্থা রয়েছে তাদের জন্য বার্তাটি হলো -

১. আপনার হাসপাতাল, জরুরি বিভাগ বা ডাক্তারের অপারেশন থিয়েটার নিরাপদ এবং আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে আপনার সেখানে যাওয়া উচিত।

২. কোভিড-১৯-এর সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির চেয়ে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকিগুলি অনেক বেশি এবং হার্টের সমস্যাগুলি আঘাত হানার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে 'সময়' খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. যদিও টেলিমেডিসিন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও এটিকে ব্যক্তিগত যত্নের বিকল্প হিসাবে দেখা উচিত নয় এবং হাসপাতালে যাওয়া অনিরাপদ হয়ে পড়েছে বলে এটিকে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করাও উচিত নয়।

কোভিড-১৯ পরবর্তী শারীরিক সমস্যা

কোভিড সেরে গেলেও সতর্ক থাকতে হবে - করোনাভাইরাস শরীরে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে।

হালকা রোগে ভুগে যাঁরা সেরে গেলেন বা যাঁদের সংক্রমণ হলেও উপসর্গ তেমন ছিল না, তাঁদের তেমন কোন দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হয় না। মাঝারি রোগীদের কিছুটা হয়। তবে যাঁরা প্রায় মৃত্যুর দরজা থেকে ফেরেন, তাঁদের ক্ষতি বেশি হয়। তবে এক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ প্রায় ৮০-৯০ ভাগ ক্ষেত্রে রোগ মৃদুই হয়। ১০-১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তার মধ্যে মাত্র কয়েক জনকেই আইসিইউ-এ ভর্তি করতে হয়।

যে সমস্ত কোভিড রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়, তার মধ্যে মোটামুটি ৪৫ শতাংশ মানুষের বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরও কিছু চিকিৎসা লাগে। ৪ শতাংশ মানুষকে কিছু দিন রিহ্যাবে রেখে চিকিৎসা করলে ভাল হয়। এক শতাংশ মানুষকেই কেবল কোভিডের জের বয়ে বেড়াতে হয় জীবনভর।

ফুসফুসের উপর প্রভাব

ইয়েল স্কুল অব মেডিসিনের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ জোসেফ ব্রেনান জানিয়েছেন, সেরে ওঠার দেড়-দু'মাস পরও কিছু রোগীর শুকনো কাশি থেকে যায়। থাকে বুকে জ্বালা ভাব। গভীর ভাবে শ্বাস টানতে, শ্বাস ধরে রাখতে ও ছাড়তে কষ্ট হয়। এর প্রধান কারণ সংক্রমণ ও প্রদাহের ফলে ফুসফুসের কিছু অংশের স্থায়ী ক্ষতি। যত নিউমোনিয়ার বাড়াবাড়ি হয়, ক্ষতি হয় তত। সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ে ধূসর প্যাচ, যাকে বলে **গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি**।

রেডিওলজি জার্নালে প্রকাশিত সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, চীনের হাসপাতালে ভর্তি থাকা ৭০ জন জটিল রোগীর মধ্যে ৬৬ জনেরই ফুসফুসের ক্ষতি হয়েছে। এদের অর্ধেকের মধ্যে পাওয়া গেছে ধূসর প্যাচ। এমনকি উপসর্গহীন কোভিড রোগীদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা গিয়েছে। এবং তার কিছু দিন পরই জাঁকিয়ে বসেছে রোগ।

এ ক্ষতি যে সহজে নিরাময়ের নয়, তার প্রমাণ আছে অতীতে। নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বিজ্ঞানীরা জানান, ২০০৩-২০১৮ পর্যন্ত ৭১ জন সার্স রোগীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন, এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে ফুসফুসের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে এবং তার হাত ধরে দৌড়ঝাঁপ করার ক্ষমতা কমেছে তাঁদের। ৩৬ জন মার্স রোগীকে পরীক্ষা করেও এই একই রকম তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তাও তো এই দুই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল একটি ফুসফুস। কোভিডে সংক্রমণ হচ্ছে দু'টি ফুসফুসেই।

"কোভিডে সমস্যা আরও বেশি হবে কি না তা এখনই বলা যাচ্ছে না। এটুকু বলা যায় যে, জটিল নিউমোনিয়া বা এআরডিএস-এ ভুগে উঠলে ফুসফুসের যে ক্ষতি হয়, তা সারতে ৬-১২ মাস লাগে। তার পরও পুরোপুরি ঠিক হবে কি না বলা যায় না। এর উপর যদি হাঁপানি, সিওপিডি বা ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ ইত্যাদি থাকে, কার্যকারিতা ফিরে আসবে বড়জোর ৬০-৭০ শতাংশ।"

হার্টের উপর প্রভাব

আগে থেকে হৃদরোগ না থাকলেও আইসিইউ তে ভর্তি কোভিড রোগীদের প্রায় ১৯ শতাংশের হার্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হার্ট ফেইলিউর, অ্যারিদমিয়া, হার্ট অ্যাটাক, সবই হতে পারে। ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের আশঙ্কা বাড়ে। হার্টের পেশী দুর্বল হয়ে রক্ত সরবরাহের ঘাটতি হয় অনেকের। ফলে আগের মতো দৌড়ঝাঁপের জীবন আর ফিরে আসে না।

চিকিৎসক জানিয়েছেন, "ভাইরাসের প্রভাবে যাঁদের হার্টের পেশীতে সরাসরি প্রদাহ বা মায়োকার্ডাইটিস হয়, সেই ক্ষতির রেশ থেকে যেতে পারে দীর্ঘ দিন। পেশী দুর্বল হয়ে রক্ত সরবরাহের ব্যাঘাত হয়। ওষুধপত্র খাওয়ার সঙ্গে ধূমপান ও মদ্যপান ছেড়ে দিলে ও ডাক্তার না বলা পর্যন্ত পরিশ্রমের কাজ না করলে ৬-৮ সপ্তাহে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়।"

কিডনি ও লিভার

কোভিডের জটিল পর্যায়ে সবচেয়ে ক্ষতি হয় কিডনি ও লিভারের। স্বাভাবিক হতে সময় লাগে কম করে ৩-৪ সপ্তাহ। কখনও পুরো স্বাভাবিক হয় না। বিশেষ করে যদি আগে থেকে সমস্যা থাকে।

রক্তের সমস্যা

প্রায় ৩১ শতাংশ জটিল কোভিড রোগীর শরীরে প্রচুর পরিমাণে রক্তের ডেলা জমতে থাকে। এ থেকে নানা সমস্যা হয়। যেমন:

- ফুসফুসে জমলে পালমোনারি এমবলিজম নামের প্রাণঘাতী সমস্যা হতে পারে। আইসিইউ-তে ভর্তি রোগীদের মধ্যে ২৩-৩০ শতাংশের এই সমস্যা হয়। সেরে ওঠার পরও অনেকের ক্লান্তি, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট লেগে থাকে। চলাফেরা ও কাজকর্মে তার প্রভাব পড়ে।
- কারও রক্তের ডেলা পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। স্ট্রোক হয়। উহানের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সেখানে আইসিইউ-তে ভর্তি রোগীদের মধ্যে ৫ শতাংশের স্ট্রোক হয়েছিল।
- কারও হার্ট অ্যাটাক হয়। ফলে হার্ট আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে যায়।
- কিডনিতে জমলে কিডনির ক্ষতি তো হয়ই, ডায়ালিসিস করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেরে ওঠার পর কিডনির কার্যকারিতা কমে যায়।
- পায়ের শিরায় জমে দেখা দিতে পারে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস নামের জটিল অসুখ। বাড়ি যাওয়ার পর হঠাৎ রোগ দেখা দিতে পারে।

এ সব কারণেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরও বেশ কিছু দিন রক্ত পাতলা রাখার ওষুধ খেয়ে যেতে হয় অনেক সময়।

কোভিড -১৯ ও মানসিক রোগ

পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোভিড -১৯ সনাক্তকরনের তিন মাসের মধ্যে প্রতি পাঁচ জনে একজন রোগীর মানসিক অসুস্থতা ধরা পড়ে এবং পূর্ব-বিদ্যমান মানসিক অসুস্থতার রোগীদের ক্ষেত্রে এমনকি অন্যান্য রোগের ঝুঁকির কারণ থাকা সত্ত্বেও কোভিড -১৯ সনাক্তকরণের সম্ভাবনা শতকরা ৬৫% বেশি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের যাদের মধ্যে ছিলো ৬২ হাজার কোভিড -১৯ রোগী তাদের স্বাস্থ্য রেকর্ড পরীক্ষা করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এনআইএইচআর অক্সফোর্ড স্বাস্থ্য বায়োমেডিকাল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে কোভিড -১৯ একজন ব্যক্তির মানসিক রোগের ঝুঁকি বাড়ায় এবং তা কোভিড-১৯ রোগ সনাক্তকরনের তিন মাসের মধ্যে প্রতি পাঁচ জনে একজন।

হৃদরোগীদের বিশেষ সাবধানতা ঃ পাল্টাতে হবে জীবনধারা

- রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে সমস্ত ওষুধ খেতে হয়, তা খেয়ে যান

নিয়মিত।

- বাড়িতে কারও জ্বর-সর্দি-কাশি হলে, তাঁর থেকে দূরে থাকুন।
- দরকার না হলে বাড়ির বাইরে বের হবেন না।
- হাত ধোওয়া ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম মেনে চলুন।
- শরীরচর্চা বন্ধ করবেন না। বাড়িতে থাকলেও হার্ট ভাল রাখার পাশাপাশি, সামগ্রিকভাবে ভাল থাকতে নিয়মিত ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে হবে। ছাদে বা বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করলে ভাল হয়।
- সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার কথা শুধু ভাবলে চলবে না, ছেড়ে দিতে হবে।
- রোজকার ডায়েটে রাখুন পর্যাপ্ত শাকসব্জি ও ফল। ভাত, রুটি অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট খাওয়া কমাতে হবে।
- লবন খাওয়ায় মাত্রা রাখা জরুরি। লবনে থাকা সোডিয়াম হার্ট ফেইলিউরের সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর করে তোলে। লবনের বাড়তি সোডিয়ামের জন্য হার্ট ফেইলিউর ও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বেড়ে যায়। লবনের সোডিয়াম রক্তবাহী ধমনীতে জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলস্বরূপ আর্টারিতে বাড়তি চাপ পড়ে একদিকে ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যায়, অন্য দিকে হৃদপিন্ডের পেশী বাড়তি চাপের ফলে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অন্যান্য নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি লবন খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে।
- নিয়ম করে যোগাসণ ও ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন।
- মন ভাল রাখতে গান শোনা আর বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুললে ভাল হয়।
- অকারণে টেনশন করবেন না। আর নিয়মিত ডাক্তার দেখাতে ভুলবেন না।
- কোনও রকম সমস্যা বুঝলে ভয় না পেয়ে অবশ্যই হাসপাতালে ডাক্তার দেখান।

কোভিড-১৯ -এ হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক

হার্টের রোগীদের জন্য ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলজি (ইএসসি) প্রেসিডেন্টের বার্তা

'কোভিড -১৯ এর সময় 'বাড়িতে থাকার' নির্দেশনাটি হার্ট অ্যাটাকের লক্ষনযুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না'।

ইএসসি প্রেসিডেন্ট বলেন "হার্ট অ্যাটাকের জন্য নির্দিষ্ট, জীবন রক্ষা করার মতো প্রমাণ-ভিত্তিক চিকিৎসা রয়েছে আর সেগুলো সবচেয়ে কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য দ্রুত হাসপাতালে যাওয়া দরকার। বিলম্ব আপনার জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে, আপনার হার্টের ক্ষয়ক্ষতি বাড়ায় এবং হার্ট ফেইলিউর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।"

মহামারী চলাকালীন, হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণযুক্ত অনেক লোক কোভিড-১৯ হওয়ার ভয়ে হাসপাতালে যেতে দেরি করছেন বা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তবে অধ্যাপক কাসাদেই বলেন : "করোনভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য হাসপাতালে অবশ্যই হার্ট অ্যাটাকের রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকতে হবে।"

আপনি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলির কোনও একটি অনুভব করলেই, অবিলম্বে জরুরি পরিষেবাগুলিতে কল করুন এবং তাদের আপনার লক্ষণগুলি মূল্যায়ন করতে দিন। হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে বুকের ব্যথা, ঘাম এবং শ্বাসকষ্ট। অন্যান্য সতর্কতা লক্ষণগুলি হল গলা, ঘাড়, পিঠ, পেট বা কাঁধে ব্যথা যা ১৫ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়।

হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের লক্ষণ সমূহ

হার্ট অ্যাটাক

- বুকের ব্যথা আরও খারাপ হয়ে যাওয়া
- বুক ধড়ফড় করা
- শ্বাসকষ্ট হওয়া
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া

স্ট্রোক

- মুখের মাংশপেশী ঝুলে পরা
- বাহু দুর্বলতা
- কথা বলতে অসুবিধা হওয়া

এই লক্ষণযুক্ত লোকদের সরাসরি অ্যাম্বুলেন্স কল করা উচিত, এমনকি যদি তাদের বা যাদের সাথে তারা বাস করেন, তাদের কভিড -১৯ থাকার কারণে তারা নিজেরা স্ব-বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। "আপনার যদি কোভিড -১৯ এর লক্ষণ থাকে যেমন উচ্চ তাপমাত্রা বা নতুন ক্রমাগত কাশি হয় তবে জরুরি সেবাগুলি আগাম জানিয়ে দিন।

ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলজি'র একটি রোগী ফোরাম রয়েছে। এই মহামারীর সময়ে করোনভাইরাস সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের কাছ থেকে অনেক প্রশ্ন পেয়েছে এখানে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর আমি বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করলাম।
আপনার নিজস্ব চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি আপনার চিকিৎসকের কাছে পরিচালিত করা উচিত।

প্রশ্নঃ আমার হার্টের সমস্যা আছে। আমি কি অন্য যাদের হার্টের সমস্যাা নেই তাদের চেয়ে কোভিড -১৯ আক্রান্ত হওয়ার বেশী ঝুঁকিতে আছি ?

উত্তরঃ না - সংক্রমণটিতে যে কেউ আক্রান্ত হতে পারে। তবে এই পরিস্থিতিতে অন্তর্নিহিত হার্টের সমস্যাযুক্ত লোকেদের সংক্রমণের লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে বা অন্যদের তুলনায় সংক্রমণ গুরুতর আরও বেশি হতে পারে .১
এখনও অবধি, বেশিরভাগ লোকেরা যারা COVID-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন তাদের গলা ব্যথা, কাশি, শরীর ব্যথা এবং জ্বর সহ হালকা ভাইরাল রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে তবে কিছু লোক (৫% পর্যন্ত) বুকের সংক্রমণ / নিউমোনিয়া দেখা দিয়েছে। হার্টের সমস্যা বেশি থাকলে আমরা এখনও নিশ্চিত নই COVID-১৯ এর সাথে বুকের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে তারা বুক যাওয়ার কারণে এটি সম্ভবত সম্ভব অন্যান্য ফ্লু ভাইরাসের এর মতো সংক্রমণ।১

প্রশ্নঃ হার্টের সমস্যাসহ সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে গুরুতর COVID-১৯ উপসর্গের ঝুঁকি কি একই রকম? নাকি পার্থক্য আছে?

উত্তরঃ সংক্রমণের ধারা সকল ব্যক্তির জন্য একই।

- আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি বা কথা বলা থেকে বাতাসে ছড়িয়ে থাকা ড্রপলেটের মাধ্যমে ভাইরাসটির সংক্রমণ ছড়ায় বা
- ভাইরাসের সংস্পর্শে আসা দূষিত পৃষ্ঠদেশগুলি যেমন, টেবিল, চেয়ার এবং দরজার হ্যান্ডল স্পর্শ করার মাধ্যমে। উল্লেখ্য পৃষ্ঠদেশগুলিতে ভাইরাসটি কয়েক ঘন্টা থেকে এমনকি কয়েক দিন বেঁচে থাকতে পারে। .১

ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পরে এটি ফুসফুসের সরাসরি ক্ষতি করে এবং ট্রিগারগুলির একটি প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সরাসরি মদদ দেয় যা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের উপরও দুই দিক থেকে চাপ দেয় সৃষ্টি করে।
প্রথমত, ফুসফুসে সংক্রমনের ফলে রক্তে অক্সিজেনের স্তর হ্রাস পায় এবং
দ্বিতীয়ত, ভাইরাসের প্রদাহজনিত প্রভাবে রক্তচাপ কমে যায়।
সেক্ষেত্রে বড় অঙ্গগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহ করতে হার্টকে অবশ্যই দ্রুত এবং শক্তভাবে বিট করতে হয়।
নিম্নলিখিত গ্রুপগুলি বিশেষ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে:

- যে ব্যক্তিরা প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত, যেমন ট্রান্সপ্ল্যান্ট রোগী, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী যারা কেমোথেরাপি বা বিস্তৃত রেডিওথেরাপি গ্রহণ করছেন, যাদের হৃদরোগের সাথে লিউকেমিয়া বা লিম্ফোমা রয়েছে তারা তাত্ত্বিকভাবে ভাইরাসের সংক্রমনের এবং মৃত্যুর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।
- অন্যান্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণ এবং দুর্বল ব্যক্তিদের পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত যাদের রয়েছে হৃদরোগ বা

কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ।

- আরও রয়েছে সেইসব ব্যক্তিরা যাদের হার্টের সমস্যার সাথে যেমন হার্ট ফেইলিওর, ডায়ালেটেড কার্ডিওমিওপ্যাথি, উন্নত ধরনের এরিথমোজেনিক ডান নিলয়ের কার্ডিওমিওপ্যাথি এবং এদের সাথে জন্মগত সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকে।
- অবস্ট্রাক্টিভ হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির রোগীদেরও একই উচ্চ ঝুঁকির বিভাগে রাখা যেতে পারে।

তবে পেসমেকার এবং কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলিটর এর মতো ইমপ্ল্যান্টেড ডিভাইসগুলিতে ভাইরাস সংক্রামিত হওয়ার কোনও প্রমাণ নেই বা হার্টের ভালভে মধ্যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস রোগ সৃষ্টি করার মতো কোন সুনির্দিষ্ট প্রমান এখনও নেই।

প্রশ্নঃ আমার ব্রুগাডা সিন্ড্রোম আছে, আমার কি বিশেষ কোনও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

উত্তরঃ ব্রুগাডা সিন্ড্রোমযুক্ত রোগীরা বিশেষত মারাত্মক অ্যারিদমিয়ায় আক্রান্ত হন শরীরের তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রী সেঃ ছাড়িয়ে যায় এমন পরিস্থিতি। এ জাতীয় রোগীদের অবশ্যই প্যারাসিটামল এবং শীতল / টেপিড স্পঞ্জিং করে আক্রমনাত্মকভাবে জ্বরের চিকিৎসা করা উচিত।

প্রশ্নঃ আমার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে - আমি কি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বেশি ঝুঁকিতে আছি?

উত্তরঃ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিজে থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় না। তবুও, অনেক অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন রোগীরা বয়স্ক এবং তাদের অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা রয়েছে যেমন হার্ট ফেইলিওর, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস, সুতরাং সংক্রামিত হলে তাদের রোগের পরিনতি আরও মারাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে। তাই সমস্ত রোগীদের সাধারণ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয় সংক্রমণ রোধ করতে সামাজিক দুরত্ব মানা, ঘন ঘন এবং যথাযথভাবে হাত ধুয়ে নেওয়া ইত্যাদি।১৩

প্রশ্নঃ আমি পড়েছি যে করোনভাইরাস হার্ট অ্যাটাক বা অ্যারিদমিয়ার মতো হার্টের সমস্যা তৈরি করতে পারে, এটা কি সত্য?

উত্তরঃ

- ভাইরাসের প্রদাহজনিত প্রভাবগুলির ভিত্তিতে, তাত্ত্বিক ঝুঁকি রয়েছে যে ভাইরাল সংক্রমণের ফলে এথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাকগুলি (ফ্যাটি ডিপোজিট) করোনারি ধমনীতে ফেটে যেতে পারে , যার ফলে

অ্যাকিউট করোনারি সিন্ড্রোম (হার্ট অ্যাটাক) হতে পারে। করোনার ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সময়ে যদি কেউ গুরুতর বুকের অস্বস্তি অনুভব করে তবে অবিলম্বে স্বাস্থ্যসেবা পরামর্শ দলকে খবর দিতে হবে।

- মারাত্মক সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেটরি অবস্থার ফলে অ্যারিদমিয়া বা এমনকি কিছু ব্যক্তির মধ্যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ট্রিগার বাড়তে পারে।
- ভাইরাস সংক্রমণের ফলে দেখা দেওয়া তীব্র প্রদাহ হার্ট এবং কিডনি ফাংশন উভয়ই নষ্ট করতে পারে

তবে এই সমস্যাগুলি রোধ করার জন্য আপনার করার মতো কিছুই নেই। আপনার সংক্রামিত হওয়া রোধ করতে যা করা উচিত তা হলো কঠোরভাবে শারীরিক দূরত্ব মেনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা, বা আরও ভাল স্ব-বিচ্ছিন্নতার মতো পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা, ঘন ঘন হাত ধোয়া ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ হার্টের রোগী যাদের ডায়াবেটিস এবং / অথবা উচ্চরক্তচাপ আছে তারা কি বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে?

উত্তরঃ এই রোগের উত্থান যেখান থেকে হয়েছিল সেই চীন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের কারনে মৃত্যুবরণকারী এবং যারা মারাত্মকভাবে এই রোগে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে কমোরবিডিটিস হিসাবে ছিল ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ। যদিও এর সঠিক কারণ এখনও অস্পষ্ট। এটা ঠিক যে, উচ্চরক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস সাধারণত বেশী বয়সের (৭০ বছরের বেশি) জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় যেখানে COVID-১৯ সংক্রমণ থেকে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি।

সম্প্রতি একটি নিবন্ধে অ্যাঞ্জিওটেনসিন রূপান্তরকরণের এনজাইম (এসিই) ইনহিবিটার এবং এনজিওটেনসিন II রিসেপ্টর ব্লকার (এ ২ আরবি / এআরবি) জাতীয় উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার ওষুধ ব্যবহারের কিছু পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে।৭ এটি মনে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি এমন একটি তত্ত্ব যা এখনও যথেষ্ট তথ্য-উপাত্য দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। তবে প্রধান হৃদস্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থাগুলি যেমন, ইউরোপীয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি, ব্রিটিশ কার্ডিয়াক সোসাইটি এবং আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস রোগীদের রোগের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে এই ওষুধগুলি চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে (যেহেতু তাদের উপকারী প্রভাবগুলি সুবিদিত)। .৮ ,৯

প্রশ্নঃ এমন প্রতিবেদন রয়েছে যে COVID-১৯ মায়োকার্ডাইটিস বা পেরিকার্ডাইটিসকে প্ররোচিত করতে পারে। যদি আপনার পূর্বে মায়োকার্ডাইটিস / পেরিকার্ডাইটিস হয়ে থাকে, আপনি কি দ্বিতীয়বার সংক্রমনের ঝুঁকিতে আছেন?

উত্তরঃ অতীতে মায়োকার্ডাইটিস বা পেরিকার্ডাইটিস রোগে ভুগেছেন এমন কোনও ব্যক্তির উক্ত রোগগুলিই কোভিড-১৯ এর জটিলতা হিসাবে দেখা দেওয়ার প্রমাণ নেই। এটা স্বীকৃত যে মায়োকার্ডাইটিসের কিছু ক্ষেত্রে একটি পুনরাবৃত্তি এবং ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সংক্রমণের ফলে তীব্র প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়ার

কারণে হার্টের ফাংশন আরও খারাপ হতে পারে এবং হার্ট ফেইলিওর রোগীদের উপসর্গগুলি বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রশ্নঃ হৃদরোগীরা কি কোভিড -১৯ আক্রান্ত হয়ে অন্যদের চেয়ে বেশি মারা যায়?

উত্তরঃ এখনও অবধি, বয়স্ক এবং অন্তর্নিহিত রোগের উপস্থিতিসম্পন্ন বিশেষকরে হৃদরোগে আক্রান্তরা বেশী মৃত্যুর ঝুঁকিতে আছে। যাইহোক, এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, বেশীরভাগ রোগী এমনকি অন্তর্নিহিত হৃদরোগে আক্রান্তরাও যাদের মৃদু সংক্রমণ হয়েছে তারা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

প্রশ্নঃ আমি জানি যে আমি সংক্রামিত হয়েছি মনে করলেই আমার হাসপাতালে যাওয়া উচিত নয় তবে আমার যদি পূর্বের বিদ্যমান হার্টের সমস্যা থাকে তবে কিভাবে চিকিৎসা নেবো?

উত্তরঃ আপনি যদি মনে করেন আপনার COVID-১৯ সংক্রমণ রয়েছে এবং উপসর্গগুলোও মৃদু তবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে নিজেই এটি বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করতে পারবেন কিনা। যেমন প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিয়ে জ্বর নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনি যদি মনে করেন বাড়িতে উপসর্গগুলি নিয়ন্ত্রণ করা অস্বস্তিকর, বিশেষত যদি আপনি শ্বাস প্রশ্বাসে অক্সিজেন স্বল্পতা বোধ করেন তবে দয়া করে দ্রুত চিকিৎসা সাহায্য চাইতে হবে।

কিছু কিছু রিপোর্টে, বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ায়, পরামর্শ দেয়া হয় যে ওষুধ যেমন আইবুপ্রোফেন (তথাকথিত নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ওষুধ বা এনএসএআইডি) যা জ্বর এবং ব্যথা কমানোর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো কভিড -১৯ রোগকে আরও খারাপ করতে পারে। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এবং ইউরোপীয় মেডিসিন এজেন্সি (ইএমএ) আইবুপ্রোফেন ব্যবহারের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই বলে তা ব্যবহারের বিপক্ষে সুপারিশ করে না। তবে যদি সন্দেহ হয় তাহলে দয়া করে আপনার চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করুন জ্বর এবং / বা ব্যথার জন্য কোন ওষুধটি আপনার জন্য নিরাপদ?

প্রশ্নঃ যেহেতু আমার হার্টের সমস্যা আছে, তাই আমার অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য কি আমার অতিরিক্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

উত্তরঃ আপনার দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুসরণ করুন - প্রতিটি দেশের আক্রান্তের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এটি কিছুটা আলাদা হবে।

প্রত্যেকেরই তাদের ঝুঁকি কমানের জন্য কাজ করা উচিত। যদি আপনার হার্টের সমস্যা থাকে, তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণঃ

> অসুস্থ লোকদের এড়িয়ে চলুন।

> যতদুর সম্ভব অন্য ব্যক্তিদের থেকে দুই মিটার বা ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন।

> কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান এবং উষ্ণ জল দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে ফেলুন

> যখন কাশি হয় তখন আপনার মুখটি একটি টিস্যু দিয়ে বা আপনার কনুইয়ের অভ্যন্তরে ঢেকে রাখুন।

> আপনি যখন হাঁচি মারেন তখন আপনার নাকটি টিস্যু দিয়ে বা আপনার কনুইয়ের অভ্যন্তরে ঢেকে রাখুন।

> আপনার চোখ, নাক এবং মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থা

> দরজার হাতল, হ্যান্ডেলগুলি, স্টিয়ারিং হুইলস বা হালকা সুইচগুলির মতো স্পর্শিত পৃষ্ঠগুলিকে ভাইরাস অপসারণ করার জন্য একটি জীবাণুনাশক দিয়ে জবিানুমুক্ত করুন।

> যদি সম্ভব হয় তবে ঘরে বসে কাজ করা সহ যতটা সম্ভব বাড়িতে থাকুন।

> আপনার যদি জ্বরের লক্ষণ থাকে (তাপমাত্রা ৩ ৩৭.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার বেশি), কাশি বা বুকে সংক্রমণ থাকে তবে আপনার ন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত।

> কিছু দেশে আপনাকে কঠোর বিচ্ছিন্নতা অনুসরণ করতে বলা হতে পারে।

প্রশ্নঃ আমার এই বছর ফ্লু এবং নিউমোকোক্কাল ভ্যাকসিন নেয়া ছিল, আমি কি এই ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত?

উত্তরঃ না। নিউমোনিয়ার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিনগুলি যেমন নিউমোকোক্কাল ভ্যাকসিন এবং ফ্লু ভ্যাকসিনগুলি নতুন করোনভাইরাস বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় না। ভাইরাসটি এত নতুন এবং পৃথক যে এর নিজস্ব ভ্যাকসিন প্রয়োজন। গবেষকরা চেষ্টা করছেন করোনাভাইরাস বিরুদ্ধে একটি ভ্যাকসিন তৈরী করতে এবং ইতোমধ্যে কয়েকটি কোম্পানি টিকা উদ্ভাবন করেও ফেলেছে। যদিও ফ্লু এবং নিউমোকোকাল ভ্যাকসিনগুলি কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে কার্যকর নয়, প্রধানত স্বাস্থ্য দ্বারা শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতাগুলির বিরুদ্ধে টিকা দেওয়ার সুপারিশ করা হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) হিসাবে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত সংস্থা।

প্রশ্নঃ ভাইরাস থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কি আমার একটি মাস্ক পরা উচিত?

উত্তরঃ এই মহামারীর প্রথম দিকে যদিও সাধারণ জনগনের সবার জন্য মাস্ক পরা জরুরী মনে করা হতো না কিন' পরবর্তীতে একটি সাধারণ মাস্ক পরা সকলের জন্য অপরিহার্য্য। এমনকি এটাও বলা হচ্ছে যে, যতদিন ভ্যাকসিন না আসছে ততদিন মাস্কই ভ্যাকসিনএবং ভ্যাকসিন নেয়ার পরও মাস্ক এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাবে না।

প্রশ্নঃ আমি কি ভিটামিন বা অন্যান্য খাদ্য পরিপূরক গ্রহণ করতে পারি? কোনটা? কোভিড-১৯ এর বিপরীতে তারা কি আমাকে সুরক্ষা দেবে?

উত্তরঃ ফরমুলা অনুসারে তৈরি ভিটামিন গ্রহণ আপনাকে কোভিড-১৯ এর থেকে রক্ষা করবে না। বেশ কয়েকটি এজেন্ট (ভিটামিন সি, হাইড্রোকুইনোন এবং অ্যান্টিভাইরালস সহ) নিয়ে বর্তমানে পরীক্ষা করা হচ্ছে তবে কোভিড-১৯ এর উপর তাদের কার্যকারীতার বিষয়ে এখনও কোনও বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চিতকরণের তথ্য জানা যায়নি।

তাজা শাকসবজি এবং ফলের সমৃদ্ধ একটি খাদ্য সাধারণত সর্বদা সুপারিশ করা হয় - না শুধুমাত্র ঠিক COVID-১৯ এর সময় নয় সবসময় এটি আপনার শরীরকে একটি কার্যকরী প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। সতেজ শাকসবজি এবং ফলের মধ্যে ভিটামিনের বড়ির চেয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে । অতএব, ফরমুলা অনুসারে তৈরি ভিটামিন গ্রহণ করে শরীরের পুষ্টি সঙ্গে ক্ষতিপূরণে চেষ্টার চেয়ে প্রচুর তাজা শাকসবজি এবং ফল খাওয়া সর্বদাই ভাল।

এই বলে যে, কিছু ব্যক্তির প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট ভিটামিন বা (মাইক্রো) পুষ্টির ঘাটতি থাকতে পারে। এই ক্ষেত্রে, আপনার চিকিৎসক ওই নির্দিষ্ট ভিটামিন খেতে আপনাকে পরামর্শ দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রণয়নকৃত ভিটামিন গ্রহণ করার সময়, দয়া করে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনার খাওয়ার প্রস্তাবিত দৈনিক ডোজ পরিমাণের চেয়ে বেশি না হয়। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ভিটামিন গ্রহণ করলে আপনার ক্ষতি হতে পারে এবং কিছু পরিপূরকগুলি আপনার হার্টের ওষুধের সাথে নেতিবাচকভাবে মিথষ্ক্রিয়া করতে পারে।

প্রশ্নঃ **আমি কি আমার পোষা প্রাণী থেকে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হতে পারি?**

উত্তরঃ মানুষ এই রোগটি সাধারণ গৃহপালিত প্রাণী যেমন, বিড়াল এবং কুকুর থেকে আক্রান্ত হতে পারে এমন কোনও প্রমাণ বর্তমানে নেই ।

প্রশ্নঃ লোকেরা কি একাধিকবার কোভিড-১৯ ধরতে পারে?

উত্তরঃ বর্তমান গবেষণাটি পরামর্শ দেয় যে প্রথম সংক্রমণের পরে কোভিড-১৯ এ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকশিত হয়, সুতরাং এটি আবার ধরা সম্ভব নয়। ফ্লু এবং এর মতো ভাইরাসের উদাহরণ রয়েছে সাধারণ সর্দি, যা ভাইরাসের পরিবর্তনের কারণে একাধিকবার ধরা পড়ে সময়ের সাথে সাথে কোভিড-১৯ এর সাথে এটি ঘটতে পারে কিনা আমরা কিছুক্ষণের জন্য জানব না।

প্রশ্নঃ **আমার কি হার্টের ওষুধের কোনও ডোজ পরিবর্তন করা উচিত?**

উত্তরঃ যা পরিষ্কার তা হল আপনার ওষুধ বন্ধ করা বা পরিবর্তন করা খুব বিপজ্জনক হতে পারে এবং আপনার অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে এই ওষুধগুলি হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার জন্য খুব কার্যকর, এবংহার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক রোধে সহায়তা করার জন্য উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। যে কোন আপনার চিকিৎসার পরিবর্তনগুলি যা স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার দ্বারা প্রস্তাবিত হয়নি আপনার হার্টের অবস্থার এক বিস্ফোরিতকরণের ঝুঁকির ঝুঁকি আপনাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

মিডিয়াতে এমন কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি চিকিৎসা করার জন্য কিছু সাধারণভাবে ব্যবহৃত ওষুধের পরামর্শ দেয় উচ্চ রক্তচাপ (তথাকথিত এসিই-ইনহিবিটারস এবং অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকারস) হতে পারে সংক্রমণের ঝুঁকি এবং করোনাভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের তীব্রতা উভয়ই বৃদ্ধি করে। তবে, এই সতর্কতার কোনও সমর্থনযোগ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা প্রমাণ নেই।

অতএব, আপনি আপনার রক্তচাপ গ্রহণ অবিরত করার জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হয় prescribedla নির্ধারিত ৮ রোগীদের যারা প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে medicla গুলি নিয়ে থাকেন, উদাহরণস্বরূপ হৃদযন্ত্রের পরে প্রতিস্থাপন, নির্ধারিত হিসাবে এই ওষুধগুলি গ্রহণ করা চালিয়ে যাওয়া উচিত। ডোজ হ্রাস করা হয় প্রতিস্থাপিত হার্টের প্রত্যাখ্যান ভোগ করার উচ্চ ঝুঁকির সাথে যুক্ত।

আপনার সমস্ত ationsla গুলি ঠিকঠাক অনুসারে গ্রহণ করুন। সন্দেহ হলে, আপনার সাথে যোগাযোগ করুন ডাক্তার বা নার্স কিন্তু তাদের সাথে কথা বলার আগে কোনও পরিবর্তন করবেন না।

প্রশ্নঃ **কিছু কোভিড-১৯ রোগীদের দেওয়া ওষুধ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা বিপজ্জনক অ্যারিদমিয়ার কারণ হতে পারে। আমার কী জানা দরকার?**

উত্তরঃ লং কিউটি সিন্ড্রোমযুক্ত রোগীদের তাদের উপস্থিতি চিকিৎসক সচেতন কিনা তা নিশ্চিত করা দরকার তাদের হার্টের অবস্থা, যদি তারা হাসপাতালে ভর্তি হন। লং কিউটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অবস্থা যেখানে হার্টের বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিতে বিলম্ব হয় যা লোককে দুর্বল করে তোলে to অ্যারিথমিয়াস (অনিয়মিত হৃদস্পন্দন)। পরীক্ষামূলক কিছু ওষুধ যা চলছে COVID-19 রোগীদের চিকিৎসার জন্য মূল্যায়ন ছঞ ব্যবধান এবং কারণ দীর্ঘায়িত করতে পারে কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে অ্যারিথমিয়াস। এই ওষুধগুলির মধ্যে ক্লোরোকুইন, একটি অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল এজেন্ট রয়েছে, এবং অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল ড্রাগস ১২ অতিরিক্তভাবে, চিকিৎসার জন্য কিছু ওষুধ ব্যবহার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন বা হতাশা, যা কোনও ব্যক্তির QT ব্যবধান দীর্ঘায়িত করতে পারে। সুতরাং, এটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপনি যে ওষুগুলি গ্রহণ করছেন সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য ডাক্তার।

আপনার যদি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয় তবে দয়া করে সর্বদা নিশ্চিত হযে নিন যে আপনি একটি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন এবং আপনার সাথে আপনার সমস্ত ওষুধের আপ টু ডেট তালিকা!

প্রশ্নঃ **আমার যদি নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত বা আমার চিকিৎসায় হাসপাতাল যাওয়া এড়ানো উচিত?**

উত্তরঃ যদি আপনার হাসপাতালে এখনও নির্ধারিত বহির্মুখী অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি চলমান থাকে তবে এটি ভাল তাদের সাথে যোগাযোগ করার এবং আপনার এখনও উপস্থিত থাকা উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করার ধারণা। অনেক জায়গা রুটিন বাতিল করছে

অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা ফোনে বা ভিডিও অনলাইন চ্যাট মাধ্যমে যেখানেই যে কোনও স্থানে সেগুলি পরিচালনা করে সম্ভব. কিছু শর্ত রয়েছে যেখানে সামনের মুখোমুখি

দেখা এখনও প্রয়োজন এবং আপনিও প্রথমে আপনার পরামর্শদাতা, ডাক্তার, নার্স বা অন্য কোনও ব্যক্তির পরামর্শ ছাড়া ভিজিট মিস করবেন না স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী.

প্রশ্নঃ আমি কি বাড়ির বাইরে নিরাপদ, যদি আমি জনাকীর্ণ অঞ্চলগুলি এড়াতে পারি তবে আমি কি পার্ক বা বাইরে হাঁটতে যেতে পারি ?

উত্তরঃ হ্যাঁ. ভাইরাস সংক্রামিত লোকদের কাছ থেকে ধরা পরে এবং তাই কোনও সমস্যা নেই নিজেই বাইরে যাচ্ছি যা গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল যে কারও সাথে যোগাযোগ এড়ানো অসুস্থ প্রচুর সংখ্যক লোককে একত্রিত করার ইভেন্টগুলি ইউরোপ জুড়ে বাতিল করা হয়েছে, সংক্রমণের বিস্তার রোধ করতে যদি আপনাকে নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে হয় (উদাঃ খাদ্য শপিংয়ের জন্য), দয়া করে নিজের এবং অন্যদের মধ্যে দুই মিটার দূরত্ব রাখুন।

প্রশ্নঃ আমি কি এখনও ভ্রমণ বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে পারি?

উত্তরঃ আপনার জাতীয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত নির্দেশিকা দয়া করে মনোযোগ দিন। ভিতরে অনেক দেশে সমস্ত অপয়োজনীয় ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং নাগরিকদের বলা হয়েছে গৃহে থাক. অনেক জায়গাতেই যদি সম্ভব হয় তবে গণপরিবহন ব্যবহার এড়ানো বাঞ্ছনীয় রং অথবা অন্যান্য যাত্রীদের থেকে কমপক্ষে ২ মিটার দূরে রাখতে।

প্রশ্নঃ আমি খুব উদ্বিগ্ন বোধ করি। ভাল বোধ করার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি?

উত্তরঃ এটি সবার জন্য উদ্বেগজনক সময় এবং আমরা আপনাকে মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য টিপস সরবরাহ করছি মহামারীকে ঘিরে যে অনিশ্চয়তা রয়েছে যেগুলি আমরা কেউই কেবল কয়েকটি জন্য প্রস্তুত ছিলাম না মাস কতক পূর্বে.

> নিয়মিত এবং স্বাস্থ্যকরভাবে ভাল খাবেন। আপনার নিজের শারীরিক শক্তি বজায় রাখা দরকার, তবে ভাল খাবার এছাড়াও আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং খনিজ দেয় যা উদ্বেগ মোকাবেলায় সহায়তা করে। পুরো শস্য, ফল এবং শাকসব্জি (সমস্ত রঙ) আপনার উদ্বেগের মাত্রা এবং সহায়তায় যাদুর মতো কাজ করবে তাদের হ্রাস করতে। আমি জানি কেক, বিস্কুট এবং চকোলেট সুস্বাদু তবে অতিরিক্ত চিনি হিট সত্যিই উদ্বেগের পক্ষে ভাল নয়। একটু এখন এবং পরে একটি ভাল জিনিস, কিন্তু আসলে খাওয়া মিষ্টি আপনাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আরও খারাপ অনুভব করতে পারে। একই মদ জন্য যায়; এটি রাখা সর্বনিম্ন

> প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন। আশ্চর্যজনকভাবে একটি শান্ত জায়গায় চা বা কফির একটি দুর্দান্ত কাপ উদ্বেগজনক চিন্তাকে শান্ত ও প্রশান্ত করার জন্য সহায়ক।

> অনুশীলন করুন। যদিও আমাদের সকলকে এখন একে অপরের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, এটি তা নয় মানে আপনি বাইরে যেতে পারবেন না আসলে, দিনের আলোতে বাইরে যাওয়া (এমনকি এটি মেঘলা থাকলেও) করবে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে হবে। আপনার যদি বাগান থাকে তবে বাগানের চারপাশে হাঁটা,এ্যারোবিক ব্যায়ামগুলি (আপনার দক্ষতার উপর নির্ভর করে সৌম্যরূপে) (বা এত মৃদু নয়) সম্পাদন করা,কোনও দড়ি দিয়ে এড়ানো, নীচে নেমে নীচে নেমে আসা সঙ্গীত, এই সমস্ত উদাহরণ অনুশীলন আপনি করতে পারেন যা উদ্বেগ দূর করতে সাহায্য করবে। যদি আপনি একটি বাগান না পেয়ে থাকেন, আপনার বাড়ি থেকে আপনি যে পথে যেতে পারবেন সে সম্পর্কে ভাবুন যেখানে আপনাকে কাছাকাছি থাকতে হবে না অন্যের সাথে সান্নিধ্য এবং বেড়াতে যান। প্রতিদিন.

> সামাজিকীকরণের ভার্চুয়াল পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করুন। আপনি যদি ফেসটাইম / স্কাইপ বন্ধু এবং পরিবারের পক্ষে সক্ষম হন আপনার মন গ্রহণ করার জন্য, এমনকি একবারে একবার বা একই ব্যক্তির কাছে প্রতিদিন এটি করুন আপনার উদ্বেগ দূরে বা তাদের রিং। এটি আপনাকে একটি পরিকল্পনা দেবে - এর প্রত্যাশার জন্য কিছু এবং আপনাকে আপনার বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রাখবে। অন্যের কথা ভাবছেন, যা হচ্ছে তা শুনছেন তাদের কাছে এবং সহায়তা প্রদান আপনার নিজের উদ্বেগ হ্রাস

করতে সহায়তা করার জন্য অবাক করে দেওয়ার মতো ভাল কাজ করে।

> কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন। আপনি যা করতে পারেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন। অর্থাৎ সেই আলমারিটি সাফ করুন, ঘরটি পুনরায় সাজিয়ে নিন, পোশাকটি ডিক্লুটটার করুন, বাগানে আগাছা লাগাবেন, ইত্যাদি আপনাকে করতে হবে না তালিকার সমস্ত কিছুই এবং একসাথে নয়, তবে এটি আপনাকে মোকাবেলা করার জন্য আরও পরিকল্পনা দেয় plans আপনি যখন উদ্বেগ বোধ করছেন। আপনি যখন কিছু অর্জন করেছেন তখন অনুভূতিটি ভাল ফ্যাক্টর আপনার তালিকায় অমূল্য।

> বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপ। সংগীত শুনুন, একটি বই পড়ুন, ক্রসওয়ার্ডগুলি মোকাবেলা করুন, বোনা, সেলাই করুন, রঙ করুন,আঁকা, ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি যে কাজগুলি করতে উপভোগ করেন তবে প্রায়শই সময় থাকে না কর যে কোনও কিছু যা হয় উদ্বিগ্ন চিন্তাগুলি থেকে বাঁচতে পারে বা প্রয়োজন হবে ঘনত্ব, আপনাকে সাহায্য করবে।

> অতিরিক্ত নেতিবাচক বার্তা এড়িয়ে চলুন। টিভিতে সংবাদগুলি দেখুন, সংবাদটি শুনুন অথবা ফোন / ল্যাপটপ দিনে মাত্র একবার। যদিও আমাদের সকলের সম্পর্কে সর্বশেষতম পরামর্শটি জানতে হবে করোনাভাইরাস এবং স্ব-বিচ্ছিন্নতা, এটি ক্রমাগত এটি রাখা গুরুতর উদ্বেগ-উদ্দীপক আমাদের কানে আপনার যা জানা দরকার তা কেবল একটি নিউজ-পঠনে পাওয়া যাবে। রাখবেন না দয়া করে নিজেকে প্রতিদিনের চেয়েও বেশি

> শ্বাস। আপনি উদ্বেগ বোধ করলে এই সাধারণ অনুশীলনটি সত্যই সহায়তা করতে পারে। বসে বা দাঁড়ানো একটি শিথিল অবস্থানে (আপনার পেশী শক্ত এবং আলগা করুন যাতে আপনি পার্থক্যটি অনুভব করতে পারেন একটি স্বচ্ছন্দ এবং উত্তেজনাপূর্ণ রাষ্ট্রের মধ্যে)। আপনার শ্বাসকে ঘন করুন এবং গভীরভাবে শ্বাস নিন ৫ এর একটি গণনা এবং ১০ এর গণনায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিন আর উদ্বেগ অনুভব করার জন্য উপরের ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি করার পক্ষে আপনার যথেষ্ট পরিমাণহ্রাস

প্রশ্নঃ ধূমপান কি আমার জন্য ক্ষতিকর? ধূমপান ছাড়লে আমার কি কি উপকার হবে?

উত্তরঃ ধূমপান করোনাক্রান্ত রোগীর জন্য ক্ষতিকর। সেইসাথে করোনায় মৃত্যুঝুঁকি কমাতেও ধূমপান বর্জন করা উচিৎ। আপনার বয়স কিংবা কতদিন যাবৎ আপনি ধূমপান করেন এটা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়, ধূমপান ছাড়লেই আপনি পাবেন অনেকগুলো উপকারীতা

১. ধূমপান ছেড়ে দিলে আপনার রক্তে অক্সিজেন-এর যোগান **৮ ঘন্টা** বেশী থাকবে।
২. ধূমপান ছেড়ে দেয়ার **১২ ঘন্টার** মধ্যে রক্তে কার্বন-ডাই অক্সাইডের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
৩. ধূমপান ছেড়ে দেয়ার **৭২ ঘন্টার** মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে যাবে।
৪. ধূমপান ছেড়ে দেয়ার **২-১২ সপ্তাহের** মধ্যে রক্ত সরবরাহ ও ফুসফুসের কার্যকারীতার উন্নতি হবে।
৫. ধূমপান ছেড়ে দেয়ার **১২ মাসের** মধ্যে আপনার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অর্ধেকে নেমে আসে।

ভ্যাকসিন বা টিকা

করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন বা টিকা

করোনা মহামারি শুরুর পর থেকে যত দিন গড়াচ্ছে, দৈনিক মৃতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়েছে আর মৃতের সংখ্যা ২২ লাখের বেশী। করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় শীর্ষে যুক্তরাজ্য। দেশটিতেও মৃতের সংখ্যা সম্প্রতি বেড়েছে। অনেকে বলছেন যুক্তরাজ্যে করোনায় যারা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে কেয়ার হোম গুলোয় মারা যাচ্ছেন ২০ শতাংশ। আর এশিয়ায় করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় শীর্ষে ভারত তারপর পাকিস্তান আর বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।

করোনা মোকাবিলায় বিশ্বজুড়ে এখন টিকার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। খুবই খুশির খবর যে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের কাছাকাছি সময়েই টিকাদান কর্মসূচী শুরু করতে পেরেছে। সারা বিশ্বের মতোই বাংলাদেশেও সর্বপ্রথম সম্মুখসারির যোদ্ধারাই আছেন টিকাদান কর্মসূচীর আওতায়। যেমন সবার আগে স্বাস্থ্যকর্মী অর্থাৎ চিকিৎসক, নার্সসহ সবধরণের স্বাস্থ্যকর্মীর কথা বলা হচ্ছে, মানে হাসপাতালে এবং ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন বা রোগীর সংস্পর্শে আসেন - এমন সবাই। যেমন মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, অ্যম্বুলেন্সের ড্রাইভার, আয়া - সবাই। কারণ তাঁরা এবং তাঁদের পরিবার সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে আছে। এরপর যারা ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি ও ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি জটিলতা, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা ধরনের কোমরবিডিটি আছে, যা করোনা সংক্রমনের জটিলতাকে বাড়িয়ে দেয়, তাঁরা এই টিকার দাবিদার। আইনশৃখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা, প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন এমন কর্মকর্তা-কর্মচারী, গনমাধ্যমকর্মী, পরিবহনকর্মী, শিক্ষক, ব্যাংকার, বিক্রয়কর্মী অর্থাৎ যাদের বহু মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, তাঁদের সবাইকে টিকার আওতায় আনতে হবে।

করোনার টিকা কাদের নেওয়া উচিৎ নয়?

- প্রথমত, অন্তসত্ত্বা ও স্তন্যদানকারী নারী এবং ১৮ বছরের নীচে বয়সীরা টিকা নেবে না। কারণ তাদের উপর এখ নপর্যন্ত টিকার পরীক্ষামূলকপ্রয়োগ হয়নি। তবে ভবিষ্যতে তারাও নেবে কিনা সে সম্পর্কে নতুন নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত তারা নিচ্ছে না।
- যাঁরা ইমিউনিটি সাপ্রেসড, মানে গুরুতর ক্যান্সার রোগী, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি নিচ্ছেন এমন ব্যাক্তরাও এই টিকা নেবেন না।
- যাঁদের অন্যান্য ওষুধ ও ইনজেকশনে মারাত্মক অ্যালার্জি আছে, তাঁদের এই মুহূর্তে টিকা নেওয়ার দরকার নেই।

করোনার টিকা কতদিন পর্যন্ত কোভিড-১৯ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবে

এখনও পর্যন্ত যেসব টিকা ব্যবহৃত হচ্ছে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সেসবের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা প্রমানিত হওয়ার পরই এফডিএর অনুমোদন পেয়েছে। ট্রায়ালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ফাইজারের টিকা ৯৪.৫শতাংশ কার্যকর, মডার্নার টিকা ৯৪.১ শতাংশ আর অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা ৬২-৯০ শতাংশ কার্যকর হিসাবে প্রমাণিত। এটি মানুষের শরীরে ব্যবহার করার পর ঠিক কতদিন সুরক্ষা দেবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। টিকা কার্যক্রম বেশ খানিকটা চলার পর তা বোঝাযাবে। তবে বিশ্বজুড়ে বেশিরভাগ মানুষকে টিকার আওতায় আনতে পারলে হার্ড ইমিউনিটি গড়ে তোলার মাধ্যমে এই মহামারিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। টিকাদানের সেটাই মূল উদ্দেশ্য।

করোনার টিকা কতটুকু নিরাপদ?

সব ওষুধ, ইনজেকশন বা টিকারই কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা মৃদু। যেমন,

- টিকার স্থানে মৃদু ব্যথা
- হালকা জ্বর
- মেজমেজ ভাব
- শরীর ব্যথা
- বমি বমি ভাব ইত্যাদি।

এগুলো যেকোন টিকার ক্ষেত্রেই হয়।

টিকা নেওয়ার পরও কি কারও কোভিড-১৯ হতে পারে?

কোন টিকাই শতভাগ কার্যকর নয়। যদি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা ৭০ শতাংশ কার্যকর হিসাবে দাবী করা হয়, তবে বাকী ৩০ শতাংশের তো ঝুঁকি থাকছেই। এর মধ্যে আমরা যে কেইউ পড়তে পারি। মানুষের শরীরে ইমিউন রেসপন্স একেকজনের একেক রকম, সেটি যেমন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর তেমনি টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সেই কারণেই টিকা নেওয়ার পরও যতদিন এই মহামারি নির্মূল না হচ্ছে, ততদিন স্বাস্থ্যবিধি আগের মতোই মেনে চলতে হবে। মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, বারবার হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশি শিষ্টাচার মেনে চলা, সামাজিক দুরত্ব মেনে চলার মতো স্বাস্থ্যবিধি আরও অনেকদিন মেনে চলতে হবে।

টিকা নেওয়ার পর কারও করোনার উপসর্গ দেখা দিলে কী করা উচিৎ?

টিকা নেওয়ার পর কারও করোনার উপসর্গ যেমন, জ্বর, কাশি, স্বাদ-গন্ধহীনতা ইত্যাদি দেখা দিলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ইচিৎ। চিকিৎসক মনে করলে তার কোভিড-১৯ পটরীক্ষাও করাতে পারেন। টিকার প্রথম ডোজ পাওয়ার

পরই আশানুরূপ সুরক্ষা মিলবে না। তাই প্রথম ডোজের পর আরেকটি ডোজ না নেওয়া পর্যন্ত একটু বেশী সতর্ক থাকতে হবে। আমরা এখনও জানিনা এই টিকা দেওয়ার পর কতদিন পর্যন্ত সুরক্ষা পাব বা আদৌ করোনা থেকে শতভাগ সুরক্ষা পাব কিনা।

কারও কোভিড হলেও কি তাঁরা টিকা নেবেন?

কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার পর প্রকৃতিক সুরক্ষা বা ন্যাচারাল ইমিউনিটি কতদিন থাকে, তা নিয়ে সংশয় আছে। তাই কারো আগে কোভিড হয়ে থাকলেও তাকে টিকা নিতে হবে। তবে করোনা নেগেটিভ হওয়ার পর ২৮ দিন পর টিকা নিতে পারবেন। খুব সাম্প্রতিককালে কোভিড হয়ে থাকলে অন্যদের সুযোগ করে দিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কিছুদিন পর টিকা দিলেও চলবে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন বা টিকা

এখনও পর্যন্ত তিনটি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন রয়েছে যার জন্য নির্দিষ্ট জাতীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এটিকে অনুমোদিত করেছে। এখনও কেউ ডাব্লু-এইউ / পিকিউ অনুমোদন পায়নি তবে আমরা ডিসেম্বরের শেষের দিকে এবং তারপরে আরও কিছু পরীক্ষার্থীর জন্য ফাইজার ভ্যাকসিনের উপর একটি মূল্যায়ন আশা করি।

এই তিনটি (এবং মডার্না এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা) সহ ৫ টি ভ্যাকসিন প্রার্থীদের কার্যকারিতা এবং সুরক্ষা ফলাফলের বৃহৎ অধ্যয়নগুলি প্রকাশিতভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তবে কেবলমাত্র একটি (অ্যাস্ট্রাজেনেকা) পিয়ার পর্যালোচিত সাহিত্যে ফলাফল প্রকাশ করেছে। আমরা অদূর ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের প্রতিবেদন আশা করি। সম্ভবত অনুমোদিত প্রার্থীদের অনুমোদনের জন্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হবে। বর্তমানে অনেকগুলি সম্ভাব্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রার্থী বিকাশ করছে।

একবার ভ্যাকসিনগুলি নিরাপদ এবং কার্যকর করার জন্য প্রদর্শিত হয়ে গেলে সেগুলি জাতীয় নিয়ামকগণের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, মান গ্রহণের জন্য প্রস্তুত এবং বিতরণ করা উচিত। ডাব্লু-এইচও বিশ্বব্যাপী অংশীদারদের সাথে এই প্রক্রিয়াটির মূল পদক্ষেপের সমন্বয় সাধনে সহায়তা করছে, বিলিয়ন কোটি লোকের প্রয়োজনে নিরাপদ ও কার্যকর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের ন্যায়সঙ্গত প্রবেশের সুবিধার্থে।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনগুলি দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা সরবরাহ করবে?

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনগুলি দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা সরবরাহ করবে কিনা তা জানা খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত গবেষণা প্রয়োজন। যাইহোক, এটি উপলব্ধ ডাটাটি উৎসাহ দেয় যে কোভিড-১৯ থেকে পুনরুদ্ধার করা বেশিরভাগ লোকেরা প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া বিকাশ করে যা অন্তত পুনর্নির্মাণের বিরুদ্ধে সুরক্ষার কিছুটা সময় সরবরাহ করে - যদিও আমরা এখনও শিখছি যে এই সুরক্ষাটি কতটা শক্তিশালী এবং এটি কত দিন স্থায়ী হয়।

এখন পরীক্ষা করা বা পর্যালোচনা করা বেশিরভাগ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দুটি ডোজ রেজিম ব্যবহার করছে।

কোভিড-১৯ এর নিরাপদ, কার্যকর ভ্যাকসিনগুলি কীভাবে বিকাশ করা সম্ভব হয়?

ডাব্লু-এইচও সতর্কতার সাথে আশাবাদী যে কোভিড-১৯ এর নিরাপদ এবং কার্যকর ভ্যাকসিনগুলি সফলভাবে বিকশিত হবে। বিকাশে সম্ভাব্য ভ্যাকসিনগুলির একটি শক্তিশালী পাইপলাইন রয়েছে, এবং কিছু ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতিযুক্ত প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর (তৃতীয় ধাপ) ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলিতে উন্নত হয়েছে।

তবে আপাতত, আমরা কখনই কোন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন উপলভ্য তা নিশ্চিত হতে পারি না। এজন্য আমাদের এই মহামারীটির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভবিষ্যতের ভ্যাকসিনের উপর নির্ভর করা উচিত নয় - আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের কাছে উপস্থিত সমস্ত সরঞ্জাম যেমন পরীক্ষা, যোগাযোগের সন্ধান, শারীরিক দূরত্ব এবং মুখোশ ব্যবহার করা উচিৎ

তথ্যসূত্র:
[১] https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
[৪] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
[৫] https://www.abc.net.au/news/science/2020-03-17/how-viruses-work-explainer/12059904
[৬] https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
[৭] https://icmr.nic.in/sites/default/files/upload_documents/Testing_sites_for_COVID19.pdf
[৮] Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

References

1. Health Organization (WHO) Q&A on coronaviruses
2. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Myth busters
3. European Centre for Disease Prevention and Control: Information on COVID-19 for specific groups: the elderly, patients with chronic diseases, people with immunocompromising condition and pregnant women
4. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19
5. World Heart Federation (WHF): The link between COVID- 19 and CVD
6. COVID-19 and the cardiovascular system
7. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?
8. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers
9. British Heart Foundation: Coronavirus: what it means for you if you have heart or circulatory disease
10. NHS: Stay at home advice
11. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks
12. COVID-19: chloroquine and hydroxychloroquine only to be used in clinical trials or emergency use programmes
13. WHO: How to handwash - 9 - R